দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ * ১৯ তম সংখ্যা * ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

এই সংখ্যায় থাকছে

- ১৯৭১ এ পরাজয়ের আগে পাক সেনা ও জামায়েত শিবিরের নির্বিচারে বুদ্ধিজীবী হত্যা ২
- সিরিয়া: ছাই হয়ে গেল আরব স্পর্ধার শেষ স্ফুলিঙ্গ ৩
- অভয়ার ওপর নৃশংস অত্যাচার ও খুনের বিচারের বাণী কি আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? ৬
- শেখ হাসিনার সময় দেশের অর্থনীতি : প্রোপাগান্ডা বনাম বাস্তব তথ্য ৬
- কী অসীম ঘৃণার চাষ চলছে এখন দুই বাংলায় : কিন্তু কেন ? ৮
- এলোমেলো কথা ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে ইতিহাসের নির্মাণ ৯
- কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা ১০
- শতবর্ষে 'কালকূট' সমরেশ বসু ১২
- শুধু নীতির ভুল নয়, আধার নিজেই একটা দুর্নীতি ১৩
- বিশ্বের সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাসকারী পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম: জাতিসংঘেররিপোর্ট ১৪
- গণতন্ত্রের প্রসারে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ১৫
- ১৮ বছরেই বিশ্বজয় বিশ্বদাবায় শাসন ভারতের ১৬
- সিল্ক রুট , প্রফেসর স্মিথ ও দাবা খেলা ১৭
- শেখ হাসিনার বিবৃতিতে বলা হল
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা ১৮
- প্রসঙ্গ বাংলাদেশ : একজন বিএনপি নেতার বক্তব্য ১৯
- বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার স্পিচ রাইটার কে? ২০

রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

সম্পাদকীয়

সংবিধান চর্চার নামে পণ্ডিত নেহরুকে আক্রমণ

সংবিধান প্রণয়নের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় এই বিষয়ে আলোচনা ছিল গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর। আলোচনার সূত্রপাত করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। আমাদের সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত গণ পরিষদ মুসলিম লীগ বয়কট করে। এই কারণে বড় লাট লর্ড ওয়াভেল গণ পরিষদ ডাকতে চাননি। তদারকি সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর চাপে অবশেষে লর্ড ওয়াভেল অধিবেশন ডাকেন ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। ড. বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ গণ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।১৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু সংবিধানের লক্ষ্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বক্তব্যটি পেশ করেন।। এই বক্তব্যটিই হচ্ছে সংবিধানের Pre amble যাতে বলা হয়েছে ভারতবর্ষ হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি মানুষ তাঁর ধর্মবিশ্বাস লালন করতে পারবে। তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। দেশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীন হলে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণে তাঁর সরকারের আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. বি আর আম্বেদকর।তাঁকে গণ পরিষদের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। তিনি ১৯৪৯ এর ২৫ নভেম্বর গণ পরিষদের শেষ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বলেন 'তিনি আজীবন যে দলের বিরোধিতা করে এসেছেন, সেই দল ও তার নেতা তাকে এই দায়িত্ব না দিলে ও সার্বিক সহায়তা না করলে তিনি এই খসড়া প্রস্তুত করে উঠতে পারতেন না।' পণ্ডিত নেহরু এতটাই গণতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করতেন। রাজনাথ সিংহ ও নরেন্দ্র মোদীরা কি এই ইতিহাস জানেন না ?

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সঠিক ভাবেই বলেছেন এই সংবিধান রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বিধান নয়। এই সংবিধান স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলশ্রুতি। তিনি সরকারী দলকে বলেন পণ্ডিত নেহরুকে আক্রমণ না করে সাম্প্রতিক সময়ের ভিত্তিতে নিজেরা আত্ম সমালোচনা করুন।

সম্পাদক
শান্তনু দত্তচৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

১৯৭১ এ পরাজয়ের আগে পাক সেনা ও জামায়েত শিবিরের নির্বিচারে বুদ্ধিজীবী হত্যা

বাংলাদেশ : বিজয়ের মাস

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস।১৯৭১ সালের এইদিনে পাক সেনারা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের যৌথ কমান্ডের কাছে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চিনা সম্প্রসারণবাদের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের ধর্মান্ধ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করে। এই সংগ্রাম দমন করার জন্য বর্বর পাক সেনাবাহিনী ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। দুই লক্ষাধিক মা বোন ধর্ষিতা হন। বর্বর পাক সেনাবাহিনীকে এই নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ, লুঠ, অগ্নিসংযোগে সহায়তা করে জামায়াতে ইসলামী দ্বারা গঠিত রাজাকার, আলবদর, আলসামস প্রভৃতি ধর্মান্ধ ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী। চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের দুদিন আগে এরা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদের ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা শহরে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরএকটি নির্দলীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ''আত্মসমর্পণের কদিন আগেই পাক মেজর জেনারেল ফরমান আলী বুঝতে পেরেছিলেন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করছিলেন। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছিলেন, পরাজিত হলেও কী করে শত্রুর যদ্দুর সম্ভব বেশি ক্ষতি করা যায়। তারই জন্যে তিনি পরিকল্পনা করেন, প্রধান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের যতোজনকে পাওয়া যায়, তাঁদের মেরে ফেলার। স্বাধীন হলেও বাংলাদেশ যাতে এই বুদ্ধিজীবীদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

আল বদর বাহিনীকে তিনি ভার দিয়েছিলেন ১৪ তারিখের মধ্যে তাঁর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সবাইকে খুন করতে। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, আশরাফুজ্জামান, কামারুজ্জামান, মঈনুদ্দীন প্রমুখ তখন আল বদর বাহিনীর প্রধান নেতা। ফরমান আলীর তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের যতোজনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো, আল বদর বাহিনী তাঁদের সবাইকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। কাউকেই রেহাই দেয়নি। তারপর নির্যাতন করে মেরে ফেলে তাঁদের। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শহীদুল্লাহ কায়সার , জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা , সেলিনা হায়দার , জহির রায়হান প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি। নিহতদের দশজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ২৬ জন ডাক্তার। (একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়?, ১৯৮৭; ও ফখরুল আবেদীনের তথ্যচিত্র আল-বদর দ্রষ্টব্য।)

এই নৃশংস এবং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কেবল ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ফরমান আলী অন্যান্য বড়ো শহরের জন্যেও তালিকা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনারা পরাজিত হয়েছিলো এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই। সে জন্যে, যতো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার লক্ষ্য ছিলো ফরমান আলীর, ততোজনকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চল্লিশজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো।"

তাঁদের মধ্যে একজন এক মেধাবী চিকিৎসক - ডা. ফজলে রাব্বি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের দুইদিন পর ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে অজস্র লাশের ভিড়ে পাওয়া গিয়েছিলো একটি লাশ। লাশটির দুই চোখ উপড়ানো। সমগ্র শরীরে জুড়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাতের চিহ্ন। দু হাত পিছনে গামছা দিয়ে বাঁধা। লুঙ্গিটা উরুর উপরে আটকানো। হৃদপিন্ড আর কলিজাটা ছিঁড়ে ফেলেছে হানাদার ও নিকৃষ্ট আলবদরেরা। লাশটি ছিলো বিশ্বখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট শহীদ অধ্যাপক ডাঃ ফজলে রাব্বির। সেই ফজলে রাব্বি তিনি যিনি হতে পারতেন বাংলাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিকেলের এমবিবিএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় সমগ্র পাকিস্তানে শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্র।

১৯৬২ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানের অধীনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমআরসিপি ডিগ্রি নিয়েছিলেন ডাঃ ফজলে রাব্বি। তাও আবার একটি বিষয়ে নয়, বরং দুটিতে। যথাক্রমে ইন্টারনাল মেডিসিন এবং কার্ডিওলজিতে। দেশে ফিরে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে।

মাত্র ৩২ বছর বয়সে ১৯৬৪ সালে মেডিসিনের উপর তাঁর বিখ্যাত কেস স্টাডি 'A case of congenital hyperbilirubinaemia S DUBIN-JOHNSON SYNDROMEV in Pakistan' প্রকাশিত হয়েছিলে বিশ্বখ্যাত গবেষণা জার্নাল 'জার্নাল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাইজিন' এ। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯৭০ সালে তাঁর বিশ্বখ্যাত গবেষণা Spirometry in tropical pulmonary eosinophilia প্রকাশিত হয়েছিলো ব্রিটিশ জার্নাল অফ দা ডিসিস অফ চেস্ট ও ল্যান্সেট এ।

১৯৭০ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই ডাঃ ফজলে রাব্বি মনোনীত হয়েছিলেন পাকিস্তানের সেরা অধ্যাপক পুরস্কারের জন্য। কিন্তু তাঁর আত্মায় ছিলো বাংলার অসহায়র্ত মানুষ। ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন তিনি সেই পুরুস্কার। মাত্র ৩৯ বছর বয়সী ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কার্ডিওলজিস্ট। আজকের দিনে কল্পনা করা যায়? মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তিনি আহত মানুষদের সেবা দিয়েছেন মেডিকেলে বসে। বেশ কয়েকদফা নিজের সাধ্যের চেয়ে বেশী ঔষধ আর অর্থ

সহায়তা দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় গোপন রেখে দিয়েছিলেন চিকিৎসাও। মুক্তিযুদ্ধের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ডাঃ ফজলে রাব্বির স্ত্রী জাহানারা রাব্বী একই স্বপ্ন দুবার দেখলেন। স্বপ্নটা এমন একটা সাদা সুতির চাদর গায়ে তিনি তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে জিয়ারত করছেন এমন একটা জায়গায়, যেখানে চারটা কালো থামের মাঝখানে সাদা চাদরে ঘেরা কী যেন। ১৫ই ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে জাহানারা রাব্বি স্বামীকে এই স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। জবাবে ফজলে রাব্বি মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি বোধ হয় আমার কবর দেখেছ'। শুনে ভয় পেলেন জাহানারা রাব্বি।

টেলিফোন টেনে পরিচিত অধ্যাপকদের কারো কারো বাড়িতে ফোন করতে বললেন। দেশের কি অবস্থা জানার জন্য। ডাঃ ফজলে রাব্বিও ফোন করলেন। কিন্তু কারো বাড়িতেই সংযোগ পাওয়া যাচ্ছিলো না। একসঙ্গে কাউকেই পাওয়া যাচ্ছেনা খানিকটা অবাক হলেন জাহানারা রাব্বি।

নাস্তা করে তাঁরা খেয়াল করলেন আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান উড়ছে। কাছেই কোথাও বিমান থেকে বোমা হামলা চালাতেই বিকট শব্দের আওয়াজ। চমকে উঠলেন জাহানারা রাব্বী।

সকাল ১০টার দিকে জানা গেল দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ উঠেছে। এমন সময়ে ডাঃ ফজলে রাব্বি তাড়ার গলায় স্ত্রীকে বললেন, 'পুরান ঢাকায় যেতে হবে একবার। এক অবাঙালি রোগীকে দেখতে যাবো। দেখেই ফিরে আসবো।' শুনেই জাহারানা রাব্বি বললেন, 'ওখানে যাওয়ার কাজ নেই। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। ওরাই তো পাকিস্তানীদের সঙ্গ দিচ্ছে।' জবাবে ফজলে রাব্বি হালকা হেসে বললেন, ''ভুলে যেও না, সে মানুষ।' জাহানারা রাব্বি বললেন,'তুমি যে বল আজই আত্মসমর্পণ করবে। তো মিরপুর মোহাম্মদপুরের লোকদের আমরা ক্ষমা করতে পারব?' গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাঃ ফজলে রাব্বি বললেন, 'আহা ওরাও তো মানুষ। তাছাড়া ওদের দেশ নেই।' জাহানারা রাব্বি বললেন, কিন্তু এতসবের পর ওদেরকে ক্ষমা আমরা কেমন করে করবো?' জবাবে ফজলে রাব্বী বললেন, হ্যাঁ ক্ষমাও করবে এবং এবং আমাদের স্বাধীন দেশে থাকতেও দেবে।'

সেদিন ডাঃ ফজলে রাব্বি বাসায় ফিরে এসেছিলেন ফের কারফিউ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই। দুপুরের খাবার ছিলো আগের দিনের বাসি তরকারি। কিন্তু ডাঃ ফজলে রাব্বী উল্টো বলেছিলেন, 'আজকের দিনে এত ভালো খাবার খেলাম।' জাহানারা রাব্বি এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। দেশের এই অবস্থায় এখানে থাকাটা বিপজ্জনক। জাহানারা রাব্বি স্বামীকে বললেন, 'চলো এখনই চলে যাই।' ডাঃ ফজলে রাব্বি বলেছিলেন 'আচ্ছা, দুপুরটা একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলের দিকে না হয় বেরোনো যাবে।'

কিছুক্ষণ পর বাবুর্চি এসে বললো 'সাহেব, বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ওরা।' সিদ্ধেশ্বরীর বাসার বাইরে তখন কাদালেপা মাইক্রোবাস ও একটি জীপ দাঁড়িয়ে। মাইক্রোবাসের সামনে বেশ কয়েক জন তরুণ। পাশেই জীপে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য দাঁড়িয়ে। যে আশংকা করছিলেন জাহানারা রাব্বি, ঠিক যেন তাই হলো। খুব হালকা স্বরে ফজলে রাব্বি জাহানারা রাব্বির দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'টিক্কুর আম্মা ওরা আমাকে নিতে এসেছে।'এরপর দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলেছিলেন তিনি। যখন মাইক্রোবাসে তিনি উঠলেন তখন সময় ঘড়িতে বিকেল চারটা।

১৮ই ডিসেম্বর ডাঃ ফজলে রাব্বির লাশটি পাওয়া গিয়েছিলো রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। দুই চোখ উপড়ানো। সমগ্র শরীরে জুড়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাতের চিহ্ন। দু হাত পিছনে গামছা দিয়ে বাঁধা। লুঙ্গিটা উরুর উপরে আটকানো। তাঁর হৃদপিন্ড আর কলিজাটা ছিঁড়ে ফেলেছে হানাদার ও নিকৃষ্ট আলবদরেরা।

এই সেই ডাঃ ফজলে রাব্বি, যাঁর গোটা হৃদয় জুড়ে ছিলো বাংলাদেশ আর অসহায় আর্ত মানুষ। তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। হানাদার ও আল বদরের ঘৃণ্য নরপিশাচেরা সেই হৃদয়কে ছিঁড়ে ফেললেই কি সমগ্র বাংলার মানুষের হৃদয় থেকে কি তাঁকে বিছিন্ন করা যায়। যায়না। হাজার বছর পরেও ডাঃ ফজলে রাব্বি থাকবেন আমাদের প্রাণে, হৃদয়ের গহীনে।

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি এই কিংবদন্তি শহীদ বুদ্ধিজীবীকে।

-সংগৃহীত

সিরিয়া : ছাই হয়ে গেল আরব স্পর্ধার শেষ স্ফুলিঙ্গ

মনিরুল হক

'আমি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হিসাবে কোনো আয়াত, মতবাদ বা হিমায়িত ঢালাই নীতি রেখে যাই না। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বিজ্ঞান ও যুক্তি'। - কামাল আতাতুর্ক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত গোটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হয় ছিল রাজতন্ত্রের কবলে না হয় ইংলন্ড বা ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে। এক বিশাল এলাকা জুড়ে মানুষের প্রধান ধর্ম ছিল ইসলাম, কিন্তু ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষরাও সংখ্যায় নেহাত কম ছিলেন না। তবে এইসব মানুষের জাতিগত বৈচিত্র্যের ভীতও ছিল বেশ শক্তপোক্ত। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রতি অনীহা এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুফল থেকে মুক্তি পেতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছিল ব্যাপক গণ-আন্দোলন। দেশের মানুষ বুঝে নিতে চেয়েছিলেন নিজেদের অধিকার, চেয়েছিলেন সংস্কার, এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রগতিশীলতার পথে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের ক্ষমতায় বসেন মোস্তফা কামাল পাশা, পরবর্তী কালে যাঁর উপাধি হয় 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ তুরস্কের পিতা। যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশে, অচলায়তনে নিমজ্জিত সমাজে তিনি আনলেন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধর্মীয়

গোঁড়ামি উচ্ছেদ করে তিনি চালু করলেন পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা। বিজ্ঞানকে দিলেন রাষ্ট্রীয় সমর্থন। তিনি কার্যকর করলেন লিঙ্গ-সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নানা পরিকল্পনা। প্রায় একশত বছর আগে ইউরোপীয় শৈলির আধুনিক জীবনযাত্রার যে সুর জনজীবনে বেঁধে দিয়েছিলেন তা তুরস্কে এখনও অনেকাংশে বলবৎ আছে।

১৯ শতকের শেষের দিক থেকেই উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল থেকে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আরব দেশগুলির মধ্যে এক সমন্বয়কারী জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। এটি PAN-ARABIAN আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রধান মুখ ছিলেন জুরজি জায়দান। তিনি আরবীয়দের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান। অসংখ্য প্রবন্ধ ও উপন্যাস এর মাধ্যমে তিনি আরববাসীর মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন ঐক্যের সুর। প্রধান ধর্ম ইসলাম হলেও এই এলাকায় খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু মানুষের বাস। সব মানুষই সাধারণ ভাবে বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকতেন। উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন উপভাষার প্রচলনও স্বাভাবিক ঘটনা। জায়দান চেয়েছিলেন ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত, আঞ্চলিক বন্ধন ছিন্ন করে গড়ে উঠুক এক সর্বজনীন আরবীয় সংস্কৃতি। তিনি মনে করতেন, প্রচলিত উপভাষাগুলির পরিবর্তে লিখিত ও অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে কোরানীয় আরবি ভাষার প্রচলন করা দরকার। প্রাক-ইসলাম ও ইসলাম যুগের ঘটনাবলী নিয়ে লিখিত তাঁর উপন্যাসগুলিকে জায়দান এমনভাবে রচনা করেছিলেন যাতে সেগুলি ধর্ম নির্বিশেষে সব আরববাসী নিজেদের বলে মনে করতে পারেন।

এই PAN-ARABIAN আন্দোলনের সূত্র ধরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে ব্যাপক ঢেউ ওঠে আরব জাতীয়তাবাদের। এর মূলে ছিল সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের আকাঙ্খা। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইরাণে তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তার পর থেকে সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপের তেল উৎপাদক ও সরবরাহকারী কোম্পানিগুলির আনাগোনা। তখন দেশের শাসনভার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয়দের হাতেই থাকতো। আরবীয়রা বুঝতে পারছিলেন তাঁদের ঠকিয়ে তাঁদেরই তেলসম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপীয়রা। বহিশত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ৩০ এর দশকে সিরীয় চিন্তাবিদ মিশেল আফলক, জাকি-আল-আরসুজি এবং অন্যান্য চিন্তাবিদরা মার্কসীয় দর্শন ও চেতনার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলি একত্রিত করে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন এবং অর্থনৈতিক সহযোগীতা বৃদ্ধির এক রূপরেখা তৈরি করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে উঠে আসেন আধুনিক মিশরের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক গামাল আব্দেল নাসের।

শুধু মিশর নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় অকুতোভয় নাসের হয়ে উঠেছিলেন আরব জীবনের এক আইকন। সুয়েজ খাল অধিগ্রহণ করে একদিকে তিনি যেমন ইঙ্গ-ফরাসী বেনিয়াদের মুখে চপেটাঘাত করেছিলেন তেমনি অপরদিকে আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করে মিশরবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন এক শস্যশ্যামল দেশ। আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, আরব সমাজবাদ, বিশ্বশান্তি ছিল তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায়। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রভাবেই আলজিরিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে সমন্বিত আরব জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার সূত্রপাত ঘটে। PALESTINE LIBAERATION ORGANISATION গঠনেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যোশেফ টিটো ও পন্ডিত নেহরুর সাথে নাসেরও হয়ে উঠেছিলেন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যমনি। এই আরব ঐক্যের আবহেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল OPEC অর্থাৎ The organisation of the oil producing countries যার প্রথম সদস্য ছিল ইরাণ, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনেজুয়েলা। এখন এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১২ এবং বর্তমান তেল উৎপাদনের ৪০ শতাংশের বেশি এবং মোট খনিজ তেলের সঞ্চয়ের ৮০ শতাংশের মতো এই রাষ্ট্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যা এর আগে নিয়ন্ত্রণ করত 'SEVEN SISTERS' নামক সাতটি ইউরোপ-আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলির একটি কনসোর্টিয়াম।

৫০ ও ৬০ এর দশক জুড়ে আরব দেশগুলিতে গড়ে উঠেছিল বাথ তথা রেনেসাঁ আন্দোলন। বাথীয় সমাজ আরবের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক চেতনা গড়ে তুলতে আলোকবর্তিকার কাজ করে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধুনিক সমাজ গঠনই ছিল বাথ আন্দোলনের লক্ষ। এঁরা মনে করতেন আরব সমাজকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ। ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বাথ আন্দোলন ও বাথ পার্টি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

কিন্তু এইসব আধুনিক, প্রগতিশীল, জনমূখী আন্দোলনের বিপরীতে একটি রক্ষণশীল, ধর্মান্ধ, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাচীনপন্থী ধারাও আরবভূমিতে সজীব ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামের আধিপত্য, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব, প্রতিপক্ষ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিবাদ, রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব স্বার্থ, রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের ক্ষমতালিপ্সা কখনও থিতু হতে দেয় নি আপামর আরববাসীকে। আর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ইজরায়েলকে সামনে রেখে আমেরিকা ও সহযোগী সাম্রাজ্যবাদীদের নিরন্তন চক্রান্ত আরব ঐক্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নতুন করে আরবভূমিকে নিয়ে যাচ্ছে অগণতান্ত্রিক, পশ্চাতমুখী, ধর্মাশ্রয়ী, দিশাহীন এক ক্ষুদ্র ও

সঙ্কীর্ণ পরিসরে যাকে পরিচয় করানো হচ্ছে PAN-ISLAMISM নামে। PAN-ISLAMISM হল জাতীয়তাবাদ বিরোধী এবং ধর্মকে অতীব প্রাধান্য দেওয়া একটি ইসলামী মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে একটি ধার্মিক ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের সংগঠিত করে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করাই এর লক্ষ। এই মতের অনুগামীরা মনে করেন শরিয়া আইন প্রচলিত না থাকায় মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে অন্ধকার যুগেই বাস করছেন। তাঁদের খাঁটি ইসলামে ফিরিয়ে আনতে হবে। এরজন্য বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে একটি নতুন খিলাফত সৃষ্টি করা দরকার। কেবল পবিত্র কোরান ও হাদিসের আক্ষরিক ও কঠোর ব্যাখ্যা ও শ্রদ্ধেয় হজরত মুহম্মদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের মধ্যেই খাঁটি ইসলামের পথে চলা সম্ভব। PAN-ISLAMISM এর এই তত্ত্বের উপর ভর করেই সারা পৃথিবী জুড়ে কত যে সংস্থা গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্যা নেই। আমরা শুধুমাত্র তাদের কয়েকটার নাম জানি যেমন, ইসলামী ব্রাদারহুড, আল কায়দা, আইসিস, হিজবুত তাহরীর, হামাস, হিজবুল্লা, হায়াত তাহরির আল-শাম, জইস-আল-ইজ্জা ইত্যাদি। এঁদের মূলমন্ত্র,-'ইসলামই সমাধান'। সিরিয়ার অগণতান্ত্রিক, নির্যাতনকারী একনায়ক আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে লড়াইয়ে নেমেছিল অন্তত ছয়টি বাহিনী। তারা সবাই যে একই লক্ষ নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল তা কিন্তু নয় বরং তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের পরস্পরিক বিরোধীতাও ছিল।

আপাতত আসাদ বাহিনী পরাজিত। ইরাণ ও লেবাননের সাহায্যও কোন কাজে আসে নি। সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছে তুরস্ক, আমেরিকা ও ইজরায়েল। আসাদ বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ঙ্কর সব কথা জানা যাচ্ছে, কারাগারগুলির দরজায় আছড়ে পড়ছেন হাজার হাজার মানুষ। আশা, হয়ত জীবিত ফিরে পাবেন তাঁর পরিবারের কাউকে। বিধ্বস্ত জনজীবন, বিপর্যস্ত অর্থনীতি। এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে ইজরায়েল সিরিয়ার হেরমান পর্বত দখল করে নিয়েছে, গোলান মরুভূমির বাফার জোন পেরিয়ে এসে সিরিয়ার পুরো বিমানবাহিনী, পুরো নৌবাহিনী এবং গোলাবারুদের ভান্ডার ধ্বংস করে দিয়েছে। আবার দেশের একটি অংশের দখল ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কুর্দ বাহিনী যারা সিরিয়ার একটি বিরাট এলাকায় অনেক বছর ধরে নিজেদের শাসন জারি রেখেছেন এবং যাদের লক্ষ্য সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাণ ও ইরাকের কুর্দ জাতি অধ্যুষীত এলাকাগুলি নিয়ে স্বাধীন কুর্দিস্তান গড়ে তোলা। আবার একদিকে যেমন লক্ষ সিরীয় সুন্নী শরণার্থী দেশে ফিরছেন তেমনি অপরদিকে লক্ষ শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ দেশত্যাগ করে অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। এই হচ্ছে বর্তমানের মুক্ত সিরিয়া!

আরব জাতিয়তাবাদী নেতাদের অনেক ভুলত্রুটি ছিল। তাঁরা অনেকেই ছিলেন কতৃত্ত্ববাদী, একনায়ক। কিন্তু প্রত্যেকেই আত্মমর্যাদার সঙ্গে শাসন করেছেন, নিজেদের মতো করে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন, প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করেছেন, বিদেশী আগ্রাসনকে সাধ্যমত প্রতিহত করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের শাসন- শৃঙ্খলের বিপ্রতীপে আরব জাতিয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সিরিয়ার হাফেজ-আল-আসাদ ছিলেন সেই আরব স্পর্ধার এক মূর্ত প্রতীক। বর্তমানের এই তথাকথিত ইসলাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ জঙ্গীরা পি এল ও-র আমৃত্যু সহযোগী, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা, আধুনিক সিরিয়ার মুখ্য কারিগর সেই হাফেজ-আল-আসাদের মৃতদেহের কফিন কবর খুঁড়ে তুলে এনে জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে।

ইউফ্রেটিস নদী বিধৌত প্রাচীন সভ্যতার ভূমি আমাদের এই সিরিয়া। তুরস্কের আনাতোলিয়া পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ইউফ্রেটিস নদী বর্তমান সময়ে যখন সিরিয়াতে পৌঁছোচ্ছে তখন তার বুকে জলের পরিমাণ থাকছে অনেক কম কারণ নদীর উচ্চ গতিপথে তুরস্ক অন্তত ১৪ টি বাঁধ নির্মাণ করেছে। আবার সিরিয়াও নদীতে বাঁধ দিয়েছে তার এলাকায়। তাই নদীর নিম্নভূমি ইরাকে জলের পরিমাণ যৎসামান্য। আগামীদিনে ইউফ্রেটিসের জলসঙ্কট আরও বাড়বে। তাই এখন আন্তদেশীয় বিবাদের অন্যতম কারণও এই ইউফ্রেটিস। আবার ইসলাম ধর্মমতে সপ্তম আসমান থেকে যে দুটো নদী পৃথিবীর দিকে বয়ে গেছে তার অন্যতম এই ইউফ্রেটিস বা ফোরাত। 'মুসলিম' হাদিস শরিফের (৭৪৫৪) বর্ণনায় এসেছে, - কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত নদীতে একটি স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে। মানুষ তা নিয়ে যুদ্ধে জড়াবে এবং প্রত্যেক দলের শতকরা ৯৯ জন মারা পড়বে। তাদের প্রত্যেকের কামনা থাকবে, - হায়! থেকে যাওয়ার মানুষটা যদি আমিই হতাম!

আমরা ঐতিহ্যের কথা বলেই আমাদের এই লেখা শুরু করেছিলাম। আমরা জানি, ফোরাত নদী মানব সভ্যতার অন্যতম ঐতিহ্যরেখা। আমরা এটাও জানি যে সেই ঐতিহ্যময় ফোরাত নদীর জল একদিন শুকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রুক্ষ-শুষ্ক সে নদীর বুকে সেদিন যে লোভের স্বর্ণপাহাড় জেগে উঠবে তা আসল না নকল তা মনুষ্য সমাজ বুঝতে পারবে, একথা কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। তবে একথা হলফ করে বলা যায় যে সেই ঐতিহ্যময় স্বর্ণযুদ্ধের শেষে বিস্তীর্ণ শীতল প্রান্তরের সেলিব্রেশন টেবিলে দু'দলের বেঁচে থাকা যে দু'জনকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখা যাবে তাঁদের বাইডেন আর আল-জোলানি বলে চিনে নিতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, সে আপনি বেহেশতেই থাকুন অথবা দোজখে!

অভয়ার ওপর নৃশংস অত্যাচার ও খুনের বিচারের বাণী কি আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদবে?

অমিতাভ সিংহ

একে কি বলা হবে? সিবিআই এর ব্যার্থতা নাকি বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে মোদী দিদি সেটিং? গত ৯ই আগস্ট ঘটা দেশের অন্যতম নৃশংস অপরাধ আরজিকর হাসপাতালে ২৭ বছরের তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন এবং তারপর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর প্রায় ১৫ ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর এফআইআর ও অতি দ্রুততার সঙ্গে মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার মত জঘণ্য কাজ যারা করেছে সেই কুচক্রি ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দিতে ব্যর্থ হল সিবিআই। ঘটনার প্রথম পাঁচ দিন তদন্তের ভার ছিল রাজ্য পুলিশের। তার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সঞ্জয় রায়কে। যার দেহরসের সঙ্গে নির্যাতিতার শরীরে পাওয়া দেহরসের মিল পাওয়া গেছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে অতি দ্রুততার সাথে হাসপাতালের একটি ঘর যেখানে নির্যাতিতার দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেটা ভেঙে ফেলা হয় নতুন করে তৈরী করার লক্ষে। কয়েকটি তলা দুস্কৃতিরা এসে পুলিশের সামনে ভাঙচুর করে গেছে। সংবাদে প্রকাশ পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুস্কৃতিদের বাধা দেওয়া বা তাদের তাড়া করার বদলে। এভাবেই পাঁচ দিনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হয়। সিবিআই এর মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দেখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা বলে মন্তব্য করেছিলেন।এই ঘটনার প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আরজিকরের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিত মন্ডলকে। কিন্তু ৯০ দিনের মধ্যে সিবিআই চার্জশিট দিতে না পারার জন্য গত শুক্রবার তারা দুজনেরই জামিন মনজুর হয়েছে শিয়ালদহ অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় আদালতে।

সিবিআই এর কৌঁসুলি আদালতকে জানান যে কোনও নথি তারা পেশ তো করছেনই না এমনকি কোনও আবেদনও করছেন না। এর অর্থ একটাই তদন্তের ফল একটা বিশাল শূণ্য। এদের বিরুদ্ধে কোনও সাপ্লিমেন্টারী চার্জশিট না দিয়ে কার্যত ভূলক জামিনের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করল সিবিআই। এমন একটা স্পর্শকাতর ও নৃশংস ঘটনা মাথায় রেখে সিবিআইয়ের সন্দেহজনক ভুমিকার সমালোচনা করতেই হচ্ছে। গত কয়েকমাস ধরে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্নস্থানে এমনকি বিদেশেও জনগণের ন্যায়বিচারের দাবী করে এত আন্দোলনকে রীতিমত উপহাস করা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনে।

১৪ আগস্ট যে রাত দখলের ডাকে সারা রাজ্যের মানুষ পথে নেমেছিল তার পুনরাবৃত্তি আবার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন সময়ে বিচারবিভাগের ভুমিকা প্রশ্নের মুখে সেখানে বিচার আদৌ হবে কিনা তার নিশ্চয়তা কোথায়। বিভিন্ন ডাক্তারদের সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলিও এই সেটিং এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। তৈরী হয়েছে অভয়া মঞ্চ। তাদের বক্তব্য নীচে দেওয়া হল।

আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার অফিসার ইন চার্জ অভিজিৎ মণ্ডল, যারা আরজি কর মেডিকেল কলেজে ঘটা জঘন্য অপরাধের প্রমাণ নষ্ট করার সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের জামিন দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে অভয়া মঞ্চ। এই সিদ্ধান্তটি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) সময়মতো চার্জশিট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে হয়েছে।

অভিযুক্তরা আরজি কর মেডিকেল কলেজের এক প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি নষ্ট করার সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করেনি, বরং আমাদের চিকিৎসা এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সততাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে।

এই গুরুতর অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায়, অভয়া মঞ্চ গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৪ ধর্মতলায় একটি প্রতিবাদ সভা করেছে। তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে এবং দায়বদ্ধতার দাবি জানাতে পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং সিবিআই পরিচালকের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে জানিয়েছে। তারা নিম্নলিখিত দাবী জানিয়েছে।

এক, সিবিআই দ্বারা অবিলম্বে সম্পূরক চার্জশিট জমা দিতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার বিলম্ব ছাড়াই সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়ত সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে সিবিআইকে নো ওবজেকশন দিতে হবে। একই সঙ্গে তারা সকল নাগরিকদের, যারা ন্যায়বিচার এবং সততার প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তাদের এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

শেখ হাসিনার সময় দেশের অর্থনীতি : প্রোপাগান্ডা বনাম বাস্তব তথ্য

সায়ক ঘোষ চৌধুরী

হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকার বাইডেন প্রশাসন সমর্থিত গণ আন্দোলনের পরে নতুন যে সরকার ক্ষমতায় বসেছে নোবেলজয়ী এবং ক্লিনটন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত ডঃ মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে, তাঁরা প্রতিদিনই হাসিনা সরকারকে অনেক দোষে দুষ্ট করছে। হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট, অত্যাচারী অনেক আখ্যা দিচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে হাসিনা সরকার ধ্বংস করেছেন, এমন অনেক দাবি করে শ্বেতপত্র প্রকাশের ধুম পড়েছে। কিন্তু সত্য তথ্য কি বলছে ?

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট লিখছে, ২০১০ থেকে ২০২৩ এর মধ্যে হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশের GDP ৬.৪ % হারে প্রতিবছর বেড়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে ২০১৫ সালে নিম্ন -মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

সব ঠিকঠাক চললে ২০৩১ সালে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়ে যেত। দৈনিক ২৫০ টাকা রোজগারের নিচের মানুষকে দরিদ্র ধরলে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ২০১০ সালে ছিল, মোট জনসংখ্যার ১১.৮%। ২০২৩ সালে কমে হয়েছে ৫%। আর দৈনিক ৪৩০ টাকা রোজগারের নিচের মানুষকে দরিদ্র ধরলে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ২০১০ সালের ৪৯.৬% থেকে কমে ২০২৩ সালে হয়েছে ৩০% । অর্থাৎ হাসিনা সরকারের সময় বাংলাদেশে মানুষের আয় বেড়েছে। গ্রামের দিকে আর্থিক বৈষম্য কমেছে। শহরে সামান্য বেড়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ছিল ৫৭.৯১%। ২০২৩ সালে ৭৪.৯৭%। মহিলা স্বাক্ষরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে যুব মহিলা স্বাক্ষরতার হার ছিল ৬০%। ২০২৩ সালে ৯৬%। এই বিষয়ে সত্যিই ভালো কাজ করেছে হাসিনা সরকার।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসিনা সরকার বাংলাদেশকে ভারতের চেয়েও এগিয়ে দিয়েছিলো। মাথা পিছু গড় আয়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী ভারতকেও ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কা, ভারত এবং পাকিস্তানের পরে ছিল। HDI বা Human Development Index বা মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ (০.৬৭) ভারতের (০.৬৪) চেয়ে এগিয়ে । SAARC ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা (০.৭৮)। infant mortality rate বা সদ্যোজাতের মৃত্যু হারেও বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে ভালো কাজ করেছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ১০০০ জন সদ্যোজাত শিশুর ১৫১.৪ জনের মৃত্যু ঘটতো (ভারতের চেয়ে বেশি)। ২০২৩ সালে সংখ্যাটা কমে ১০০০ জনে ২৪.৪ জনে এসে দাঁড়িয়েছে (ভারতের চেয়ে কম) । যে দেশের প্রতি ইউনুস সরকার ভালোবাসায় মগ্ন, সেই বাংলাদেশের জন্মদাতা পিতা পাকিস্তান সব বিষয়েই সবার চেয়ে পিছনে। বাংলাদেশের fertility rate বা মহিলা পিছু শিশুর সংখ্যা ১.৯৫ । ২০১০ সালে ছিল ২.৩৪। নারীশিক্ষায় জোর এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ণের ফলেই বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এই বিষয়েও এগিয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি ২০২৩ সালের নিরিখে মোট কর্মীসংখ্যার ৪২%, যা ভারতের চেয়েও বেশি। ৫ বছর আগে ৩৬% ছিল। gender gap বা লিঙ্গ বৈষম্য কমানোয় বাংলাদেশ SAARC অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সবার চেয়ে এগিয়ে, ভারতের চেয়েও। বাংলাদেশের রপ্তানী ২০২৩ সালে ৫৫.৭৯ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১০ সালের রপ্তানীর (১৯.২৩১ বিলিয়ন ডলার)-এর ৩ গুণ !

বাংলাদেশের হাসিনা বিরোধী অংশের একটি বড় অভিযোগ হলো,'হাসিনা বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন'। এই অংশটি আবার চীনপন্থীও। ২০২১ সালের হিসাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক পার্টনার ভারত নয়, চীন। বাংলাদেশের ৩২% আমদানী চীন থেকে রপ্তানির মাত্র ২% চীনে। বাংলাদেশের ১৮.৭%আমদানী ভারত থেকে। রপ্তানির ৩.৪% ভারতে। তার মানে ব্যবসায়িক ঘাটতি বা trade deficit ভারতের চেয়েও চীনের সঙ্গে বেশি। অথচ ভারতবিরোধী স্লোগান দেওয়ার সময় একজন রাজনৈতিকক নেতাকেও এই বিষয়ে বলতে শোনা গেলো না। বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি যখন ভারতে কেনা নিজের স্ত্রীর শাড়ি পোড়ালেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওঁর 'চীনা দ্রব্য বয়কট করুন' ডাকও বোধ করি দেওয়া উচিত ছিল। রুহুল সাহেব আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে, 'বাংলাদেশের sanitation ব্যবস্থা ভারতের চেয়ে ভালো'। যেটি ভুল তথ্য। ২০১০ সালে বাংলাদেশে sanitation ব্যবস্থা ছিল ৫৬% মানুষের জন্যে। ২০২৩ সালে সেটি ৬৫% মানুষের জন্যে হয়েছে। কিন্তু ভারতে ৯৭.৭% মানুষ sanitation সুবিধা পান। এই বিষয়ে রুহুল সাহেব উত্তেজনার আতিশয্যে মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন।

অতএব, হাসিনা সরকারকে খারাপ প্রতিপন্ন করার যে ধুম পড়েছে, প্রকৃত তথ্য সেই ইঙ্গিত দেয় না। হাসিনা সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নষ্ট করেছিল, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি করেছিল - এই সব অভিযোগের ভিত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের যে দুটি প্রধান কারণ , (১) কর্মসংস্থানের অভাব (২) খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, দুটি কারণের পিছনেই বিশ্ব অর্থনীতি দায়ী। নতুন সরকার এলেই রাতারাতি এই সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলবেন এমন ভাবার অবকাশ নেই। বরং ইউনুস সরকার আসার পরে খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমেছে। এবং কোনো সমস্যার সমাধান না করে ইউনুস সরকার হাসিনার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিরোধিতাকে হাতিয়ার করেছেন।

অভিযোগ তোলা হচ্ছে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপরেও। 'রাজাকার'-দের মহিমামন্ডিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশ কাদের ছেড়ে এসেছিলো সেটা বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা দেখলেই মালুম পড়বে। আরব সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যে ধারা গোঁড়া ইসলামের মধ্যে অবস্থান করছে, তা থেকে আলাদা করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে একটি ধারার জন্ম হয়েছিল। গত ৫৩ বছর ধরে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চললেও বাংলাদেশ সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'-এর বক্তব্য গুলিকে দূরে সরিয়ে রাখলে দেখা যাবে, বাংলাদেশকে জামাতপন্থী সংগঠনগুলির দ্বারা বহুবার বিপথগামী করার চেষ্টা হলেও বাংলাদেশ সফল ভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। নারী ক্ষমতায়ণে বিশেষ করে। পাকিস্তানের মহিলা পিছু সন্তান উৎপাদনের (৩.৪১) তুলনায় বাংলাদেশের হার (১.৯৫) উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।

কিন্তু বর্তমানে যে 'উল্টা রাজার খেল' শুরু হয়েছে তা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতোই বিপথগামী করে কিনা সেটাই হচ্ছে দেখার। কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামি যুক্ত সরকার সংখ্যালঘুর কি সর্বনাশ করে সেটা আমরা জানি , কিন্তু নারীদের ক্ষমতায়ণের মহা সর্বনাশ করে। কর্মক্ষেত্রে যোগদানের হার কমিয়ে দেয়। বালবিবাহ এবং অধিক সন্তান উৎপাদনের প্রবণতা বাড়ায়। শেষে দেশের অর্থনীতিতে নৈরাজ্য তৈরি করে।

ইউনুস সাহেবের হাসির আড়ালে এমন নৈরাজ্য তৈরির সম্ভাবনা আছে কিনা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, শেখ হাসিনার উপর্যুপরি নির্বাচন জয় যদি অগণতান্ত্রিক এবং অবৈধ হয়, মহ ইউনুসের ক্ষমতারোহণও জনতার স্বীকৃতি নিয়ে হয় নি। কিছু স্বঘোষিত চ্যাংড়া ছাত্রের দ্বারা হয়েছে, যাঁদের জনসমর্থন পরীক্ষিত নয়। হাসিনা ক্ষমতা কব্জা করে থাকলে ইউনুসও সেই দোষে দুষ্ট। অতএব গণতান্ত্রিক ও অবাধ নির্বাচনটি সবার আগে প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে হাসিনা সরকারের পারফরমেন্স আদৌ খারাপ ছিল না। ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দিতে তৈরি থাকবে।

কী অসীম ঘৃণার চাষ চলছে এখন দুই বাংলায় : কিন্তু কেন ?

পল্লব কীর্ত্তনীয়া

বাংলাদেশে হিন্দু বিদ্বেষের সঙ্গে ভারত বিদ্বেষ বিষের মতো উগরে দিচ্ছেন শাসন ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বৃত্তে থাকা দলবল। কারণ তাঁরা জানেন বাংলাদেশের এই প্রবল ডামাডোল আর অরাজকতার ভেতর, প্রবল দুর্মুল্যে নাভিশ্বাস ওঠা জনগণের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে এই ধর্মান্ধতা আর অন্ধ জাতীয়তার পথই একমাত্র সোজা পথ। এর চেয়ে মানুষকে অন্ধ করার, বোকা বানানোর, হিংস্রতাকে জাগিয়ে তুলে এককাট্টা করে তাদের মূল সমস্যা ভুলিয়ে দেবার মত সহজ পথ পৃথিবীতে আর আবিষ্কার হয়নি। দেখবেন এই দেশেও রামমন্দিরের ধর্মখেলা, পাকিস্থানে সার্জিকাল স্ট্রাইক বা পুলওমা কাণ্ডের জাতীয়তার জিগির বিজেপিকে হিন্দু ভোট সংহত করে জিততে কীভাবে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান কাণ্ডে ভারত ধীরে চল নীতিতে খেলছে। আমি, 'ভারত কেন আগামীকালই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করছে না', এরকম ছেঁদো কোনো যুক্তির কথা বলছি না। আন্তর্জাতিক স্তরে আরও সক্রিয় হয়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের বিপক্ষে বৃহৎ শক্তিগুমির সমর্থন আদায় করে বাংলাদেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে কোনঠাসা করার তেমন কোন চেষ্টাই নেই যেন ভারতবর্ষের শাসকুলের। কারণ বিজেপি ভাল করেই জানে ওদেশে হিন্দুবিদ্বেষ যত তীব্র হবে এদেশে তাদের ভোট ব্যাংক ততই ফুলে ফেঁপে উঠবে। সেই অঙ্কে এদেশে মুসলমান বিদ্বেষ, বিষোদগার, ঘৃণা ছড়ানো শুরু হয়ে গেছে প্রবলভাবেই।

কিন্তু এতে একটু মুশকিল দেখা দিয়েছিল। ভারতের অতি ধীরে চলো নীতির ফলে এখানে হিন্দু নেতাদের অনেকেই (যেমন কার্তিক মহারাজ), 'প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন', 'ভারত কেন বাংলাদেশের হিন্দুদের বাঁচাতে আরও সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছে না', এসব প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। দৃশ্যতই বিজেপি বিশেষত এই বাংলার বিজেপি বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে। এই সংকট থেকে তাঁদের বাঁচাতে নেমে পড়ল তৃণমূল।

আপনারা খেয়াল করে দেখবেন বিজেপি মুসলমান বিদ্বেষ ছড়াতে সবচেয়ে যে কথাটি বেশি বলে তা হল, 'এই দেশে মুসলমানরা একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং দেশটাকে দখল করে নেবে'। আমাদের মেয়র জনাব ববি হাকিম ঠিক সেই কথাটাই কোনো একটা ছোটখাটো মুসলিম সভায় বললেন। সেটা এমনিতে বাইরে খুব একটা ছড়ায়নি। সবাই আবার সেটা জানতে পারল বিজেপির অমিত মালব্যের টুইট থেকে। কী চমৎকার বোঝাপড়া ! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ঘৃণার চাষ। হিংস্রতার চাষ ! বিজেপি এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রবল উদ্যমে।

আপনাদের কি মনে হয় এটা ববি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। একেবারেই না, এটা আসলে সম্পূর্ণ জেনে বুঝে তৃণমূলের বিজেপিকে অক্সিজেন জোগানো। না হলে ভুজুংভাজুং দিয়ে ববিকে কুনাল সমর্থন করতেন না। এবার আবার দলের পক্ষ থেকে ববিকে কিছু লোকদেখানো ধমক টমক খেতে হতে পারে। তবে কাজের কাজ হয়ে গিয়েছে।

এবারে এর সঙ্গে সিবিআই ইডির সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয় কর্মকাণ্ডের কোনো যোগ যদি আপনি না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। অভয়া কাণ্ডের চার্জশিটের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম নিয়োগ দুর্নীতিতে এতগুলো গ্রেফতার কিন্তু তাদের চার্জশিট হল না কেন? সবাই বেবাক জামিন পেয়ে গেল যে! আর লিপস এন্ড বাউন্সের আর্থিক দুর্নীতির কেসে কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর কাকু গ্রেফতার হলেও তাঁর মালিক কি করে বাইরে থাকেন? তিনিও তো কাকুর মতো ওই কোম্পানিরই ডিরেক্টর ছিলেন! অবশ্য কাকুও এতকাল হাসপাতালের আরামশয্যা শেষে চার্জশিট না দেওয়ায় জামিন পেয়ে গেছেন। তার কণ্ঠস্বর নিয়ে কী হল কেউ জানে না।

কী বুঝলেন তবে? আপনাকে এখন ঠিক করতে হবে এই মিথ্যের, এই ঘৃণার, এই দুর্নীতির, এই বোকা বানানোর পক্ষে দাঁড়াবেন নাকি পক্ষ নেবেন মানবতার এবং সত্যের।

আমি কেবল ভালোবাসা বলতে পারি।

লেখক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী।

এলোমেলো কথা

ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে ইতিহাসের নির্মাণ

শুভ বসু

ইতিহাস অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংলাপ। অতীত কে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, অনুভব করার প্রয়াস করি। সেই অতীতের ঘটনাবলীর ধারা প্রবাহ বর্তমানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত, আবার অনেকে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মুঘল সম্রাট বাবরের ভারতে আগমন ছিল সুদূর অতীতের ঘটনা। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর এসেছিলেন ভারত জয় করতে। মার্জিত রুচির সংস্কৃতিবন্ পুরুষ ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষা চাগতাই তুর্ক - এর উপর দখল ছিল। তাতে নিজের আত্মজীবনী 'বাবর ই নামা' লিখেছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে খুব সফল সেনাপতি তা বলা যাবে না। আমির তৈমুরের বংশধর ছিলেন কিন্তু নিজের জন্মস্থান ফরগনার উপর দখল রাখতে পারেন নি। কাবুলের শাসক ছিলেন। দিল্লির শাসক ইব্রাহিম লোদীর সভাসদদের মধ্যে গন্ডগোল এবং রাজপূত সংঘের প্রধান রানা সঙ্গের কূটনৈতিক আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। সে যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো , রাজার তাঁদের সেনাবাহিনী সাজাতেন, অন্যরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতেন আর প্রজাদের থেকে কর আদায় করতেন। জাতি, জাতিসত্ত্বা সীমানা নির্ধারিত মানচিত্র এবং রাজা প্রজার সম্পর্ক নিয়ত আধুনিক যুগের মধ্যে ধারণা ছিল না। প্রজাদের সাধারণ জীবনের সঙ্গে রাজার জীবনের সম্পর্ক মূলত তৈরী হতো জমিদারদের মাধ্যমে যাদের থেকে ইকতা-দাররা কর আদায় করতেন। রাজার ধর্ম রাজার কাছে থাকতো। রাজারা তাঁদের পারলৌকিক আধ্যাতিক জীবনের জন্যে মন্দির মসজিদ নির্মাণ করতেন। যুদ্ধে জিতে গেলে রাজনৈতিক কারণে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মন্দির এবং মসজিদ লুঠ করতেন। শৈব রাজারা তাদের বিজিত প্রতিদ্বন্দীর মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে এসে নিজেদের রাজপ্রাসাদে মন্দির নির্মাণ করে রেখে দিতেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দীর মন্দির ধ্বংস করে দিতেন। বৈষ্ণব রাজারাও তাই করতেন। আবার সেনাপতিরা মসজিদ নির্মাণ করতেন। তবে ইউরোপের খ্রিস্টীয় সভ্যতার মতো এতো রক্তপাত হতো না। ধর্মযুদ্ধের রেওয়াজ ছিল না। তুর্কিদের মধ্যেও ছিল না, শৈব বৈষ্ণব বা লৌকিক ধর্মের মানুষের মধ্যেও ছিল না। আবার জাতপাত দীর্ণ হিন্দু সমাজের মধ্যে রাজপূত রাজারা কোনো শুদ্রকে সমকক্ষ মনে করতেন না।

রাজা বাদশাহ আমির ওমরাহরা তাঁদের শাসন কালকে কালোত্তীর্ণ করার জন্যে তৈরী করতেন প্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির বাগিচা। মুঘলরা ইরানিদের সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন। চাহারবাগ বলে একধরণের কোরানে বর্ণিত বেহেশতের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক বিনোদনের জন্যে বাগিচা নির্মাণ করতেন। এতে তাঁদের প্রজাদের মধ্যে ভক্তি ছড়াতো, একটি লেজিটিমেসি প্রতিষ্ঠা পেত। ইতিহাসের অতীত আমাদের কাছে সে যুগের স্মৃতি হিসাবে থাকলো, কিন্তু সেই অতীত এক ভিন্ন দেশ।

ধর্ম মানুষের জীবনকে ধারণ করে। ভারত বর্ষ , জম্বুদ্বীপ , আর্য্যাবর্ত আর ছিল সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেখানে লৌকিক, বৈদিক আর আবার ইসলামের সুফিধারা মিলে মিশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক জীবনের গভীরতম উপাদান ছিল। মহারাষ্ট্রের বারকরীরা, উত্তর ভারতে দাদু, কবির বাংলায় শ্রী চৈতন্য ধর্মের লৌকিক ভক্তিমুলক দিক সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে তুলে ধরলেন।

ইংরাজ শাসনে এলো মানচিত্র , রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা , প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনো, অতীতকে জানার জন্যে ইতিহাস। এক সাহেব ভারতে পদার্পন না করে ভারতীয়দের ইতিহাস লিখে ফেললেন। ভারতবর্ষের ধারণা তৈরী হলো পৌরাণিক অতীত এবং ইংরেজ মানচিত্রর সম্মেলনে। ভাষা জাত জাতি লোক গণনা ধর্মের সীমারেখা সবের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদানে নতুন করে ভাবা শুরু হলো।

বিংশশতকের স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্র রাজা প্রজার সম্পর্ক শুধু করপ্রদানের থেকে নতুন করে কল্যানমুলক দৃষ্টিতে চিন্তা করা হলো। সংবিধান এলো। সংবিধানের ভাষাতে বলা হলো আমরা আমাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করছি। আমরা কারা/ আমরা কি ধর্মীয় গোষ্ঠী , আমরা কি ভাষা গোষ্ঠী না আমরা একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী এক নাগরিক অধিকার সম্পন্ন জাতি। আমাদের অতীত কি রকম ? সেই বির্তকের মধ্যে কেউ বললেন আমাদের নাগরিক পরিচিতি নির্ভর করে আমরা ব্রিটিশদের রচিত মানচিত্রের মধ্যে যে দেশের ভূগোল রয়েছে তাকে যদি পবিত্র ভূমি এবং পিতৃভূমি বলে কল্পনা করি তাহলেই আমরা 'হিন্দু'। ভারত হল হিন্দুদের দেশ। হিন্দু কে? সেই হিন্দু কি বৈদিক সংস্কৃতির ধারক বাহক, মহাভারতের গীতার নিষ্কাম কর্মের অনুসারী, না ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের জাতপাত দীর্ণ আচার ব্যবহার অভ্যস্ত, না কোনো বিশেষ ভাষা গোষ্ঠী, তার কোনো সংজ্ঞা নেই। কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের নিজের সত্ত্বার পরিচিতি বোধ বদলাতে নাটক করতে হবে। বলিউডের নির্ধারিত পৌরাণিক কল্পনার বাস্তবের প্রয়োগ করতে আধুনিক টয়োটা ভ্যান কে সাজাতে হবে পুরাণিক গাথার রথ হিসাবে। আর যুদ্ধযাত্রা করতে হবে অশ্বমেধ যোগ্যের মতো নয় নরমেধ যজ্ঞের। তার মূল লক্ষ কি ?পৌরাণিক লোক গাথা যা আমাদের কে ধারণ করেছে বহু অতীত থেকে তার একটা যুদ্ধঙ দেহি রূপ দিতে হবে। আর ঘোষণা করতে হবে লড়াই এক অতীতের ধ্বংসাবশেসের

বিরুদ্ধে । প্রতিবেশীর ধর্ম কে অপমান করে অতীতের জিঘাংসা কে চরিতার্থ করতে হবে। অতীত শুধু অতীত নয় তার সঙ্গে বর্তমানের সংবিধান এবং শাসনতন্ত্রকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেটাই আমাদের শৌর্য্যের পরিচয়। ৬ ই ডিসেম্বর আমাদের সেই অতীত নিয়ে যে আত্মপরিচিতির সংকট এবং জিঘাংসার একটি বাস্তব রূপ। কিন্তু তাতে কি গরিবের খাদ্য এসেছে ? মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যার সমাধান হয়েছে? নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। সে প্রশ্ন আপনারাই করবেন।

ইতিহাস নিয়ে যখন পড়া শুরু করেছিলাম তখন অতীত আর বর্তমানের সংলাপ তার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আত্মপরিচিতির সংকট সেগুলি শুধু তত্বের মাধ্যমে জানতাম কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ এখন দেখছি। ছোটবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!

কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা

মিলন দত্ত

২

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। ওই বছরই বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয় 'প্রগতি'। 'নির্বাচিত শিখা'র সম্পাদক আব্দুল মান্নান সৈয়দ ওই বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, 'প্রগতিতে ছিল উত্তরৈবিক আধুনিক সাহিত্যের উৎসার, শিখায় নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমানের ভাবনা-বেদনার বহুদা বিকাশ'। 'ধর্মকে কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকগণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন', বলেছেন খোন্দকার সিরাজুল হক। এই কাজটাই জীবনভর করে গেছেন ওদুদ। তাঁর মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী, 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস নয় যা বিশ্বাস তাই শাস্ত্র'।

কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই ওদুদের ভবিষ্যৎ চিন্তা চেতনার ভিত গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ ছাত্র জীবন থেকে ওদুদকে চিনতেন ঘনিষ্ঠভাবে। ওদুদের মৃত্যুর পরে 'দেশ' পত্রিকায় (১২ আষাঢ় ১৩৭৭) মুজফফর আহমদ লিখেছিলেন, 'কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯১৩ সালে। সে-বছর তিনি মফঃসলের কোনও স্কুল হতে মেট্রিকুলেশন পাস করে এসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। থাকতেন গবর্ণমেন্ট বেকার হোস্টেলে। এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের হোস্টেল। আমি সেই হোস্টেলে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তাইতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি চৌকস ছাত্র ছিলেন।'

১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার পাংসা থানার বাগমারা গ্রামে ওদুদের জন্ম। ওদুদ তাঁর জীবনের সূচনাপর্বে নিজের কথায় সংক্ষেপে বলেছেন (ময়মনসিংহের উৎফুল্ল রায় নামে এক তরুণ লেখককে লেখা ১৩৫৮ সালের একটি চিঠিতে), 'জন্ম ফরিদপুর জেলায় নদীয়া সীমান্তে, পদ্মার ধারে, বনেদি কিন্তু সঙ্গতিহীন পরিবারে। শৈশব উদযাপিত প্রধানত পিতৃগৃহে, কৈশোর প্রধানত মাতুলালয়ে, নদীয়া জেলায়, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদার মাইল ২৮ পুবে, পদ্মার ধারে। পদ্মা তাই আমার শৈশবের সঙ্গী, প্রবল সঙ্গী।' এই পদ্মা পরবর্তীকালে এসে পড়েছে তাঁর 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে। ওদুদ মূখ্যত প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি উপন্যাস এবং কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। ওদুদের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে রশিদ আল ফারুকি বলেছেন, 'এই সব গল্প-উপন্যাসে মুসলিম কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই শ্রেণীচয়ন তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি প্রকৃত মুসলিম সমাজকে তাঁর কথা সাহিত্যে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কোনওপ্রকার আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি।'

মূলত ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। থাকতেন মামা নাজিরউদ্দিনের কাছে। বেঙ্গল পুলিশের ইন্সপেক্টর মামার ছিল বদলির চাকরি। ঘনঘন স্কুল বদলাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকার মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (প্রবেশিকা) পাস করেন। আত্মজীবনীমূলক চিঠিতে ওদুদ আরও জানাচ্ছেন, 'ধর্মকে ভালবাসতে হবে কিন্তু গোড়ামী অচল; এই ধারণায় আমি উপনীত হই প্রবেশিকা পাশের পূর্বেই। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ পড়িনি। প্রবেশিকা পাস করে যাই কলকাতায়। সেখানে কয়েকদিন এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাসায় ছিলাম। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, একটু ব্রাহ্ম-ঘেঁষা, রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত গীতাঞ্জলি থেকে গান হত। গানগুলো শুনেই আমি মুগ্ধ হই, আর রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়ার পূর্বেই গীতাঞ্জলি কিনি। তারপর থেকে আমি রবীন্দ্রানুরাগী।' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সারা জীবনের দিশারী। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ওদুদ লিখেছেন অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং তিনটি গ্রন্থ।

বিচিত্র, ঋজু চরিত্রের এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক কেমন ছিলেন তার পরিচয় কিন্তু তাঁর সমসময়ের কারও স্মৃতিচারণা থেকেই তেমন পাওয়া যায়নি। তবে টুকরো কিছু তথ্য

জানা যায়। যেমন, 'ওদুদ ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু অসামাজিক ছিলেন না। ঢাকায় নাজিমুদ্দিন রোডে বাসকালে তাঁর বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিকদের মজলিস বসতো।' জানাচ্ছেন ওদুদের জীবনীকার খোন্দকার সিরাজুল হক। এ ছাড়া অরবিন্দ পোদ্দারের একটি স্মৃতিচারণা ('কাজী আবদুল ওদুদ স্মরণীয় বাঙালি, মননশীল ব্যক্তিত্ব', দৈনিক পূর্বদেশ, ৬ই আষাঢ় ১৩৭৭) থেকে জানতে পারি, 'শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহী ওই মানুষটাকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে মাঝেমধ্যে দেখা যেত হাতে দু'একটি নতুন অথবা পুরাতন পুঁথি। রাস্তায় দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে বাক্যালাপেও কোনও আপত্তি ছিল না। চলন বলন চাহনি এবং অন্তরের ব্যাকুলতায় তাঁকে মনে হত সুদূর; যেন কোনও স্বপ্নকে তিনি অন্তরে লালন করছেন, যাকে ঠিক এই মুহূর্তে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, অথবা সম্ভবপর নয়। সামান্য কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় ওদুদ সাহেব অপরের মধ্যে সেই স্বপ্ন ও আদর্শ সঞ্চারিত করতে পারতেন।' যথার্থ বলেছেন অরবিন্দ পোদ্দার। আমরাও তো আজ ওদুদের সেই স্বপ্ন আর আদর্শের উত্তরাধিকার নিয়েই এই দুর্লঙ্ঘ্য অসময়টুকু পেরতে চেয়েছি। সাহস সঞ্চয় করেছি।

১৯১৭ সালে ওদুদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। বিয়েতে তাঁর সংস্কৃত ছিল। তিনি আরবি এবং উর্দু শিখেছিলেন কলেজের বাইরে। আরও দু'বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন অদুদ। বিএ পাস করার পরেই ওদুদকে বেকার হোস্টেল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মুজফফর আহমদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, 'তিনিও (মামা) যখন কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে গেলেন তখন ওদের সাহেব কিছুদিন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে তার বন্ধু 'মোসলেম ভারত'-এর আফজাল-উল হক সাহেবের সঙ্গে থাকেন। ওই সময়েই কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর পল্টন ভেঙে যাওয়ার পরে ওখানে থাকতে আসেন।' তখন থেকে তাঁর নজরুলের সঙ্গে হৃদ্যতা। এবং তখন থেকেই, এইভাবেই সম্ভবত ওদুদ মুসলমান সমাজের সংস্কার চিন্তায় নজরুলের কাছাকাছি এসে পড়েন। এম এ পাস করার পরের বছরই ওদুদ চাকরি নিয়ে ঢাকা চলে যান।

কাজী আবদুল ওদুদের সমসাময়িক আরও দুই মুসলমান যুবক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে ঢাকায় যান প্রায় একই সময়ে। খন্দকার আজিজুল হকের মন্তব্য, 'আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিন জন মুসলমান যুবক যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁরা সঙ্গে করে হিন্দু বিদ্বেষের বীজ বয়ে আনলেন না , বয়ে আনলেন পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানের জন্য মুক্তির বাণী।' ওদুদের সেই মুক্তি-ভাবনার অনেকটা জুড়ে ছিল রামমোহন। উনিশ শতকের এই নেতাকে নিয়ে তাঁর 'নবপর্যায়' (দ্বিতীয় খন্ড ১৩৩৬) গ্রন্থে 'নেতা রামমোহন' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রয়েছে। সেখানে ওদুদ বলেছেন, 'রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু - মুসলমান এই দুই প্রবল প্রবল ধারার সঙ্গমস্থল ছিল।' রামমোহন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থেও। ১৯৫৫-৫৬ সালে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে ওদুদ দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে। সেই বক্তৃতামালাই বাংলার নবজাগরণ নামে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ থেকে বই হয়ে বেরিয়েছিল। তারও আগে ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আরও একবার ওদুদ তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে, 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' নামে ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতামালাও পরে বই হয়ে বেরোয় বিশ্বভারতী থেকেই। তখনকার দিনে (এবং আজকেরও) জটিলতম যে সমস্যা তাই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কেন ওদুদকে আমন্ত্রণ জানালেন, সেই প্রসঙ্গের রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনই আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা। তাই একদিন সমাদরপূর্বক তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছি, অনুরোধ করেছি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বক্তৃতা করার জন্য।'

ওই বক্তৃতাতেই ওদুদ জানিয়েছেন তার বিশ্বাসের কথা। ওদুদ বলেছেন, 'ভারতীয় জাতীয়তত্ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ এবং পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয়-চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার।' (তৃতীয় বক্তৃতা ব্যর্থতার প্রতিকার)। ওদুদ এই ভাবেই বুঝতে চেয়েছিলেন 'আধুনিক' ভারতের মনন ও মানবিকতার স্বত্ব। ওদুদের এই অন্তহীন যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমানের আত্মা অনুসন্ধানের সংকটময় পর্বে, গত শতাব্দীর কুড়ি দশকের মাঝামাঝি; যখন ভারতীয় রাজনীতির স্বরাজ সাধনায় গান্ধীজির প্রবেশ, জন্ম হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার, তুরস্কের উন্নয়ন এবং ইসলামের সার্বিক সংস্কারে ব্রতী মুস্তাফা কামালের উত্থান। তখন একদিকে স্বদেশের বন্ধনমুক্তি, স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্য, অন্যদিকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পথে মননের, চিন্তার স্বরাজের কথা বলছিলেন, 'বুদ্ধির মুক্তি'র ভাবুক ঢাকার একদল মুসলমান যুবক। ওদুদ তাঁর 'শাস্বত বঙ্গ'-এর 'নিবেদন'-এ বলেছেন, 'বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার এবং শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান; বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়তো বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।খ দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তাফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের এ কালের জাগরণের সঙ্গে। আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের জাগরণের সঙ্গে।'

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

শতবর্ষে 'কালকূট' সমরেশ বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বরে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। কালকূট ও ভ্রমর তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর রচনায় রাজনীতি, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে বারবার। ১৯৮০ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। সুরথনাথ সমরেশ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনের দ্বৈততা, দ্বৈধতা প্রকাশ হয় 'কালকূট'নামে। অবশ্য সে নামে যা লিখেছেন তা ছিল সোজাসাপ্টা বয়ান। কিন্তু ব্যক্তি ও সাহিত্যিক সমরেশের গোটাটা ধরতে হলে 'কালকূট' শব্দটিই বেশি মানানসই। বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল লেখকের নাম সমরেশ বসু। দেবেশ রায় তাঁর মৃত্যুতে লেখা রচনাটির শিরোনামই দিয়েছিলেন, 'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লেখক এবং পেশাদার লেখক'। তিনি আমাদের মতো অফিস - পালানো কেরানি লেখক ছিলেন না, যাঁদের সাহস নেই লেখাকে জীবিকা করার অথচ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা শখ আছে লেখক হওয়ার।'

সমরেশরা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন দেশভাগের বেশ আগেই। তাঁর শৈশব কাটে নৈহাটিতে। কিন্তু বুকের মধ্যে বিক্রমপুরের স্মৃতি ছিল। পরবর্তী সময়ে উপন্যাসে সে স্মৃতি এসেছে বারবার। সেই স্মৃতি থেকেই এঁকেছিলেন 'ত্রিদিবেশ'কে। 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসের চরিত্র ত্রিদিবেশ। দুরন্ত, খামখেয়ালি কিংবা বোহেমিয়ান সমরেশের ক্ষেত্রে প্রতিটিই বলা যায়। তার সূচনা হল পরের বছরেই। বন্ধুরা যখন দশম শ্রেণিতে বই নিয়ে ব্যস্ত, সমরেশ স্বামীর সংসার ছেড়ে আসা গৌরীর প্রেমে পড়লেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ সম্পর্ক মানতে পারেননি, সমাজও খুশি হয়নি। সমরেশ উৎকণ্ঠিত আত্মীয়স্বজন ও বিড়ম্বিত সমাজকে বাড়তি ভাবনার অবকাশ না দিয়ে গৌরী দেবীকে নিয়ে নৈহাটি ছেড়ে চলে যান। জগদ্দলের কাছাকাছি আতপুরের একটি বস্তিতে তাঁদের ঠাঁই হয়। মার্কসের অর্থনীতির তত্ত্ব বুঝেছিলেন কিছু পরে, কিন্তু খিদের সত্য বুঝেছিলেন ওই সময়েই। পরিবারে ছিল অসচ্ছলতা। সে কারণে বিচিত্র সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে। এক সময় মাথায় করে ডিম ফেরি করেছেন। স্ত্রী গৌরী গান জানতেন আর তাতেই আরও কিছু রোজগার হয়েছে। ১৯৪৩ সালে, মাত্র ১৯ বছর বয়সে পরিচয় হয় জগদ্দল অঞ্চলের শ্রমিক নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে। তিনি ছিলেন সমরেশের রাজনৈতিক গুরু। তিনি সমরেশের হাতের লেখার গুণে তাঁকে পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেন, কিন্তু লেখার হাতের কথা জানতেন না। তবে আঁকার বিষয়ে সমরেশের দক্ষতার কথা জানতেন। সে সূত্রেই ইছাপুর বন্দুক কারখানায় সমরেশের চাকরি মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বলে অস্ত্রের চাহিদা বেশি আর তাই সমরেশের শিল্পীসত্তার প্রয়োগ ঘটল অস্ত্র কারখানায়। বস্তি থেকে কারখানার মিস্ত্রিদের পাড়ায় গিয়ে ওঠেন। সংসারে সন্তান এসেছে। জেনেছেন চাকরির কর্মের সঙ্গে তাঁকে ভাবতে হবে শ্রমিকদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়ার লড়াইয়ে। এই সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তৃতীয় উপন্যাস 'বি টি রোডের ধারে' উৎসর্গ করেছিলেন 'সত্য মাস্টারের উদ্দেশে' লিখে।

কিন্তু বেশিদিন কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি। প্রশ্ন করার মতো শিড়দাঁড়া থাকলে কিছু জায়গায় টেকা যায় না। সমরেশ প্রশ্ন করেছিলেন। তাই পার্টিতে থাকতে পারেননি। ১৯৪৯-৫০ সালে তাঁকে জেলে যেতে হয়। পার্টির কাজের জন্যই তিনি জেল খেটেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর মনে এক ধরনের পরিবর্তন আসে এবং তিনি রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। জেলে বসেই তিনি তার প্রথম উপন্যাস 'উত্তরবঙ্গ' রচনা করেন।

জেল থেকে মুক্তি, চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ বছরের সদস্য পদ ত্যাগ করা আর অনিশ্চিত পূর্ণ সময়ের লেখক-জীবন বেছে নেওয়া, সবই ঘটতে থাকে ১৯৫১ সালের কাছাকাছি সময়ে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গ ছাড়লেও শ্রমজীবী মানুষ আর তাদের সংগ্রামের সঙ্গীদের যে সঙ্গ ছাড়েননি, তার প্রমাণ 'বি টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র মতো নানা উপন্যাস ও অনেক গল্প।

ক্রকালকূট মানে তীব্র বিষ। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে' সহ অনেক উপন্যাস তিনি এই নামে লিখেছেন। বহমান সমাজ থেকে বাইরে গিয়ে একান্তে বেড়াতে ঘুরে বেরিয়েছেন আর সে অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন ভ্রমণধর্মী উপন্যাস। হিংসা, মারামারি আর লোলুপতার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি অমৃতের সন্ধান করেছেন। তাই কালকূট নাম ধারণ করে হৃদয়ের তীব্র বিষকে সরিয়ে রেখে অমৃত মন্থন করেছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। অমৃত বিষের পাত্রে, মন মেরামতের আশায়, হারায়ে সেই মানুষে, তুষার শৃঙ্গের পদতলে ইত্যাদি এই ধারার উপন্যাস।

১৯৫৪ সালে কুম্ভমেলায় যান আর সেখানের মানুষজনের সঙ্গ লাভে 'কালকূট'-এর জন্ম হয়। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখা হল, যার ভাব আর ভাষা তাঁর আগের লেখা থেকে আলাদা। কিন্তু বামপন্থী সমরেশ কেন গিয়েছিলেন সে মেলায়, কীই বা পেয়েছিলেন তাঁর মেলায় আসায় এক বৃদ্ধার মুখ দিয়ে শুনিয়েছিলেন কালকূট, 'বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমিও একজন, তখন সুখে আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে।'

কালকূট এই জনজীবন ও জনপদের কথা নানা ভাবে তাঁর এই ধারার রচনায় লিখে গেছেন। 'শাম্ব' শুরু করেছিলেন রাজবৃত্তে, কিন্তু শেষ হয়েছে লোকবৃত্তে। পিতা কৃষ্ণের অভিশাপ যেন শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল শাম্বের জীবনে।

লেখক হিসেবে সমরেশ আমৃত্যু যে লড়াই করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। তার নিজের জীবনই আরেক মহাকাব্যিক উপন্যাস। 'চিরসখা' নামের প্রায় ৫ লাখ শব্দের বিশাল উপন্যাসে সেই লড়াইকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তারই পুত্র নবকুমার বসু। ছোটদের জন্যে তার সৃষ্ট গোয়েন্দা গোগোল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। গোগোলকে নিয়ে বহু ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন যা শিশুসাহিত্য হিসেবে সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গোগোলের দুটি কাহিনি গোয়েন্দা গোগোল ও গোগোলের কীর্তি নামে চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। সমরেশ বসু প্রণীত উপন্যাসের সংখ্যা ১০০।

শুধু নীতির ভুল নয়, আধার নিজেই একটা দুর্নীতি

সুমন সেনগুপ্ত

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের খবরের মাঝে একটা খবর। এক বাংলাদেশী নাগরিককে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, তিনি জালিয়াতি করে, ভারতীয় আধার, পাসপোর্ট বানিয়ে, ভারতীয় নাগরিক হয়ে উঠেছিলেন। সেই সমস্ত পরিচয়পত্র দেখিয়েই, তিনি কলকাতার একটি হোটেলে থাকছিলেন। পুলিশের দাবী, ধৃত, সেলিম মাতব্বর, বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টি (বিএনপি)র সক্রিয় সদস্য। গত দু'বছর আগে আওয়ামী লীগের কর্মীদের সঙ্গে গোলমালে তাঁর নাম জড়ানোয়, তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন এবং নিজের নতুন পরিচয় তৈরী করেন, নাম নেন রবি শর্মা। তারপরে তিনি নিজের আধার তৈরী করেন রবি শর্মা নামে এবং তা দেখিয়ে তিনি ভারতীয় পাসপোর্ট অবধি বানিয়ে নেন। তদন্তে জানা গেছে, তাঁর পাসপোর্টটি বানানো হয়েছে রাজস্থান থেকে। পুলিশী তদন্ত জারি আছে এবং খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে, কে বা কারা এই ভুয়ো আধার এবং পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত।

এই খবরটির সঙ্গে আরো একটি খবরকে যদি এক করে পড়া যায়, তখনই বোঝা যাবে আমরা সরকারের আধার সংক্রান্ত যে কোনও ফরমানকে মেনে নিয়ে কতটা বিপদ, নিজেদের জন্য নিয়ে এসেছি। আধার আদৌ কোনও বৈধ পরিচয়পত্র কি না, সেই প্রশ্ন উঠে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমান, নতুন প্যান কার্ড আনা হচ্ছে। প্যান ২.০। বলা হয়েছে, এই নতুন প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত থাকবে এবং আধার দেখিয়েই এই নতুন প্যান কার্ড করতে হবে। অত্যাধুনিক এই নতুন প্যান কার্ডে থাকবে, 'ডায়ানামিক কিউ আর কোড'। এই নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ফলে, সরকার অবশ্য বলেছে, যাঁদের কাছে পুরনো প্যান কার্ড আছে, তাঁদের এখনই নতুন করে আবেদন করতে হবে না, কিন্তু আগামীদিনে তা যে কখনোই করতে হবে না, সেই নিশ্চয়তা সরকারের অর্থমন্ত্রক কিন্তু দেয়নি। ফলে আয়কর দেওয়া প্রতিটি নাগরিক যাঁরা প্যান কার্ড এবং অন্য আরো একটি প্রাথমিক পরিচয়পত্র দেখিয়ে আধার পেয়েছিলেন, তাঁদের সেই আধার দেখিয়ে নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে না, তা এখনই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। অর্থ মন্ত্রক যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতেও বেশ কিছু 'কিন্তু, এবং, পর্যন্ত' জাতীয় শব্দ আছে। বলা হয়েছে, এখনই আবেদন না করতে হলেও, কোনও ব্যক্তির যদি ঠিকানা, ই- মেইল এবং মোবাইল নম্বরের বদল করতে হয়, তাহলে নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, ধীরে ধীরে সমস্ত নাগরিককে এই নতুন প্যান ২.০ নেওয়ার জন্য ঘুরিয়ে জোর করা হবে।

দুটো খবরই আজকের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একদিকে সমস্ত কিছুর সঙ্গে আধারকে যুক্ত করার যে প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে, তখন যদি এইরকম উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহলে তো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। শুধু আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা কেন, দেশের অর্থনীতি এবং তার সঙ্গে নাগরিকদের প্যান কার্ডের বিষয়টিও এই বিষয়টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে, অর্থনৈতিক জালিয়াতির বিষয়টিও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য এই ধরনের জাল আধারের খবর নতুন নয়। এমনকি হনুমানেরও আধার আছে, এই খবরও পাওয়া গিয়েছিল এক সময়ে। বারবার প্রশ্ন উঠেছে, যে আধারের তথ্যভান্ডার পরীক্ষিত নয়, যে আধারের তথ্যভান্ডারে কত ভুয়ো আধার আছে, তা জানা নেই, সেই আধারকে যদি অন্যান্য পরিচয়পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে তো জানাই যাবে না, কোনটা ভুয়ো প্যান বা কোনটা জাল পাসপোর্ট।

শুধু কলকাতা থেকে ধৃত ঐ বাংলাদেশী ব্যক্তি নন, কেউ যদি ঐ রকম ভুয়ো আধার দিয়ে একটি নির্বাচনী পরিচয়পত্র বানিয়ে নেন এবং তিনি যদি ভারতের কোনও নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম তুলে ফেলেন, তখন কি সেটা ভারতের গণতন্ত্রের জন্যেও অশনি সঙ্কেত নয়? যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশের ভোটার তালিকা তৈরী হয়, এই নাম তোলা বিষয়টি কি খুব কঠিন কোনও ব্যাপার? কোনও নজরদারির বিষয় কি থাকে? কোনও রাজনৈতিক দল, কী প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টির বিরোধিতা করবে, তা কি তাদের জানা আছে? উল্টে তারাই যদি প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে, এই রকম ভুয়ো আধার তৈরী করে ভুয়ো নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত করে, তাহলে নির্বাচন কমিশনই বা কী করে তার বিরোধিতা করবে? সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্রের বিধানসভা

নির্বাচনে বিরোধীদের একটা মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। লোকসভা নির্বাচনের পরের চারমাসে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ে প্রায় ৪৭ লক্ষ নতুন ভোটারদের নাম তোলা হয়েছে। কী প্রক্রিয়ায় এই নাম তোলা হলো ৪ মাস সময়ের মধ্যে, সেই প্রশ্নের পাশাপাশি আরো কিছু প্রশ্ন করতে হয়, নির্বাচন কমিশনকে। যাঁদের নাম তোলা হয়েছে, তাঁরা কী প্রমাণপত্র দেখিয়ে এই নাম তুললেন? লোকসভা নির্বাচনের পরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি, প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাইকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর নিজস্ব ভোটারদের নাম, তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার ফলে, তিনি প্রায় হেরে যাচ্ছিলেন। সামনে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন, আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে, ইতিমধ্যেই অভিযোগ করা হয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বহু নাম বাদ পড়েছে। কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশন বলেছিল, আধার দেখিয়ে একজন ব্যক্তিকে তাঁর ভোটার কার্ডকে যাচাই করিয়ে নিতে হবে। হাতে গোণা কিছু ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করার ফলে অবশ্য নির্বাচন কমিশন বলেছিল, শুধু আধার নয়, অন্য যে কোনও পরিচয়পত্র দেখিয়েই এই যাচাই করা যাবে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন নিজেই, এই জালিয়াতির রাস্তা খুলে দিলে, সাধারণ মানুষের কি কিছু করার থাকে? পুলিশ প্রশাসনেরই বা কী করার থাকে? যখন নির্বাচন কমিশন আধারকে অন্যতম একটি পরিচয়পত্রের মান্যতা দিয়েছিল ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে, তখনও অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন নির্বাচন কমিশনকে, কী করে চেনা সম্ভব একজন ব্যক্তির আধারটি সঠিক কি না। যথারীতি নির্বাচন কমিশন সেদিনও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি এবং আজও তাঁরা জানেন না, একজন ভোটকর্মী কী করে আধার দেখে একজন ভুয়ো ভোটারকে সনাক্ত করবেন?

সুতরাং শুধু নীতির ভুলে একজন ব্যক্তি মানুষের হয়রানি হচ্ছে এমনটা নয়, কিংবা শুধু মানুষ সচেতন নয় বলেই, তাঁদের 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' করে সর্বসান্ত করা হচ্ছে এমনটা নয়। আধার, বিষয়টাই একটা জালিয়াতির পূর্বশর্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তা রোধ করা এখন প্রায় অসম্ভব। এই মূহুর্তে আমাদের সরকার জানেই না, কোন ব্যক্তির আধার ভুয়ো এবং সেই ভুয়ো আধার দেখিয়ে, তিনি কোনও প্যান কার্ড বা পাসপোর্ট বা ভোটার কার্ড বানিয়ে, ভোটার তালিকায় নাম তুলে একজন ইতিমধ্যেই বহাল তবিয়তে ভারতীয় নাগরিক হয়ে, সরকারি সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন না কি? প্রশ্নটা আসলে অনেক বড় এবং তা করতে গেলে করতে হবে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে প্রথমে, যাঁরা জেনে অথবা না জেনে এই আধারের প্রবর্তন করেছিলেন, তারপরে করতে হবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, যিনি খুব সচেতনভাবে সেই আধারকে সমস্ত পরিচয়পত্রের সঙ্গে যুক্ত করার ফরমান দিয়েছিলেন, এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মিথ্যে বলেছিলেন, যে আধার একটি অদ্বিতীয় পরিচয়পত্র, যা নকল করা সম্ভব নয়। শুধু নীতির ভুল নয়, আধার নিজেই একটা দুর্নীতির পূর্বশর্ত।

বিশ্বের সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাসকারী পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম : জাতিসংঘের রিপোর্ট

শুভাশিস মজুমদার

ক্ষমতা দখলের জন্য অচ্ছে দিন আর রাম রাজ্য স্থাপনের প্রচার মোদী লাগাতার চালিয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইনডেক্সে ভারতের অবস্থান ক্রমশই ভারতবাসীর কাছে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষুধা ইনডেক্স, হ্যাপিনেস ইনডেক্স, প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স,এবং আর্থিক ইনডেক্স গুলিতে ভারতের ক্রম অবনতি দৃশ্যমান।

জাতিসংঘের (ইউনাইটেড নেশনস) সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে দারিদ্র্যের এক ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে। এই রিপোর্ট বলছে,ভারত বিশ্বের পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১.১ বিলিয়ন বা ১১০ কোটি মানুষ, তাদের অর্ধেকেরও বেশি নাবালক, বিশ্বব্যাপী তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে।

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ভিত্তিক অক্সফোর্ড পোভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (ওপিএইচআই) কর্তৃক সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) এর সর্বশেষ আপডেট প্রকাশিত হয়েছে।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী এই ১১০ কোটি দরিদ্র মানুষের ৪০ শতাংশ যুদ্ধ, দাঙ্গা পীড়িত দেশ গুলিতে বসবাস করে। ভারত সেই অর্থে সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ বা দাঙ্গা পীড়িত দেশ না হলেও আশ্চর্যজনক ভাবে এই দরিদ্র মানুষদের সর্বাধিক, ২৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ, ভারতে বসবাস করে। তাই ভারতের ক্ষেত্রে এর অন্তর্নিহিত কর৯ কি সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের দিকেই নির্দেশ করে।

ভারত ছাড়া বাকি চারটি দেশ - পাকিস্তান (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ), ইথিওপিয়া (৮ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ), নাইজেরিয়া (৭ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ) এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গ (৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ), যেখানে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের বসবাস। এই পাঁচটি দেশে বিশ্বের ১১০ কোটি সর্বাধিক দরিদ্র মানুষদের ৪৮.১ শতাংশ বাস করে।

আর এক দিকে, জীবন যাত্রার খরচ ও খাদ্য সমেত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভয়ংকর আর্থিক চাপে আছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, তাঁরা (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) খরচ করতে চাইছেন না। খাবার থেকে তেল-সাবান-শ্যাম্পুর মতো রোজকার ব্যবহারের

ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) প্রস্তুতকারক কিংবা গাড়ি-স্কুটারের নির্মাতারা তা টের পাচ্ছে। এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন নেসলে, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, বজাজের মতো সংস্থার কর্তারা।সম্প্রতি নেসলে ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সুরেশ নারায়ণ বলেন, ''আগে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল, যেখানে আমরা ব্যবসা করতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তাতে সঙ্কোচন হচ্ছে।'' তাঁর মতে, দেশের বড় ও মেট্রো শহরগুলিতে ব্যবসা বৃদ্ধির হার ভাল নয়। গত ছয় থেকে নয় মাসে মধ্যবিত্ত মানুষের কেনাকাটার ক্ষমতা কমেছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সব থেকে বড় চিন্তা।

টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের এমডি সুনীল ডি'সুজাও মন্তব্য করেছেন, মধ্যবিত্তের কেনাকাটা কমেছে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাজাজ অটো কর্তৃপক্ষ।

অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষ বাধ্য হয়ে সস্তার বিকল্প দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য অর্থনীতিবিদ রথীন রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গণতন্ত্রের প্রসারে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

মজিবুর রহমান

আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের সঙ্গে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া।কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা কতটুকু গণতান্ত্রিক তা নিরূপণের প্রধান মানদণ্ড হল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। মিডিয়াকে মুক্ত ও নিরাপদ পরিসর প্রদান করা না হলে গণতন্ত্রের যথার্থ অনুশীলন সম্ভব হয় না।সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষিত হলেই মতের বহুত্ব ও পথের বিবিধতার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। গণতন্ত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্য সমালোচনা শোনার সংস্কৃতির প্রয়োজন হয়। শাসকের সহনশীলতার ঘাটতি ঘটলে গণতন্ত্র তার সৌন্দর্য হারায়।সংবাদমাধ্যম সবচেয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এই সমালোচনার কাজটি করতে পারে।তাই সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের প্রহরী (ওয়াচ ডগ)।মিডিয়া আক্রান্ত হলে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিপন্নতার সম্মুখীন হয়।

মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন, উভয় প্রকার সংবাদমাধ্যমের প্রধান কাজ সংবাদ পরিবেশন করা।তবে সেই সংবাদকে সত্য, রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ ও সামাজিক দিক থেকে গঠনমূলক হতে হবে।মিথ্যা ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।এজন্য বলতে হয়, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা শুধু সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রতিক্রিয়া যাতে নেতিবাচক না হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।পত্রিকার কাটতি অথবা চ্যানেলের টি আর পি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চটকদার, চাঞ্চল্যকর, অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন কখনও কাম্য হতে পারে না।হলুদ সাংবাদিকতা পাঠক-দর্শকের রুচি বিকৃত করে যা গণতন্ত্রের পক্ষে অশুভ।

শুধু গণতন্ত্রের প্রসার নয় স্বাধীনতার আন্দোলনেও সংবাদমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।১৯২২-এর সূচনা কাল থেকেই আনন্দবাজার পত্রিকা বিদেশি বা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নিয়মিত লিখেছে। ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে জনমত গঠন করেছে। ১৯৪৭ সালে অধিকাংশ সংবাদপত্রের অবস্থান ছিল দেশভাগ তথা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। নবগঠিত পাকিস্তান যখন অগণতান্ত্রিক ভাবে বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করছিল তখনও কলকাতা-ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।১৯৭১-এ পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধে বাংলার সংবাদমাধ্যমকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে।বহু সংবাদকর্মী মুক্তিকামী মানুষের সমর্থনে কলম ধরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।আসলে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই একটা উন্নত স্তর।

এই মুহূর্তে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রের পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিডিয়ার মুখোমুখি হন না।তিনি কখনও সাংবাদিক বৈঠক করেন না।মিডিয়াকে তিনি তাঁর প্রচারক হিসেবে দেখতে চান কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে চান না।এভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অমর্যাদা করে চলেছেন।শুধু তাই নয়, নির্ভীক ও আপোসহীন সাংবাদিক - সম্পাদক যাঁরা শাসকের শাসানিকে পরওয়া না করে তার প্রতিস্পর্ধী হতে চেষ্টা করেন তাঁদের মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।এজন্য গৌরী লঙ্কেশরা খুন হয়ে যান অথবা সিদ্দিক কাপ্পানরা বিনা বিচারে কারাবাস করেন।গত সাত বছরে শাসক তথা সরকারের বিরোধিতা করার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হয়ে ব্রিটিশ আমলের আইনে বিশিষ্ট নাগরিকদের জেলবন্দী হওয়ার ঘটনা বেড়েছে।আদিবাসী আন্দোলনের নেতা ৮৪ বছর বয়সী গুরুতর অসুস্থ স্ট্যান স্বামীকে সরকারের অত্যন্ত অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে জেলবন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।কিন্তু শাসক কর্তৃক সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা কিংবা সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ সহ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে যে মাত্রা ও তীব্রতায় মিডিয়ার পক্ষ থেকে সম্মিলিত প্রতিবাদ সংঘটিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। এমনকি সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপও অনেক সময় সংবাদমাধ্যমে সমর্থিত হচ্ছে।মিডিয়ার একাংশ শিরদাঁড়া সোজা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বলেই এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে।সরকারি বিজ্ঞাপনের অস্ত্র দিয়ে

শাসকশ্রেণী সংবাদমাধ্যমের আনুগত্য ক্রয় করছে।আজ ভারতে মিডিয়া হয় আক্রান্ত নয় বিক্রিত। এজন্য গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের অবনমন ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত সংবাদপত্র অথবা নিউজ চ্যানেল গণতন্ত্রের প্রসারে খুব একটা অবদান রাখতে পারে বলে মনে হয় না কারণ সেখানে সংবাদ নির্বাচন, পরিবেশন ও বিশ্লেষণে নিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ করা হয় না।নিজের দলের সবকিছুই ভালো আর বিরোধী দলের কোনওকিছুই ভালো নয়, এই মানসিকতা বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পরিপন্থী।এজন্য দলীয় মুখপত্রের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।সাংবাদিক যদি দলদাসে পরিণত হন তবে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিবিড় অনুশীলন চলছে যার বাড়বাড়ন্ত রোধে সংবাদমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত জরুরি।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যত মজবুত হবে গণতন্ত্রও তত প্রসারিত হবে।অনেক সময় দেখা যায়, সংখালঘু সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় পরিচয় জুড়ে দিয়ে মিডিয়ায় বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় কিন্তু সংখাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষদের অপকর্মের আলোচনায় কখনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ ওঠে না।এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দু'চারজন ব্যক্তির দুষ্কর্মের জন্য কোনও ধর্মমত অথবা সম্প্রদায়কে দায়ী করা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসব-অনুষ্ঠান-সাংস্কৃতিক চর্চার ইতিবাচক দিকগুলো মিডিয়ায় এলে পরস্পরকে জানার পরিসর বাড়ে।তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, সংবাদমাধ্যম সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসব নিয়ে এক মাস ধরে মেতে থাকবে আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসবের আলোচনা একদিন অথবা এক ঘন্টায় শেষ হয়ে যাবে, এটা সঙ্গত নয়।সংখ্যালঘুর গুরুত্ব খাটো করে দেখার ফলে সে হীনমন্যতায় ভোগে যা সংখ্যাগুরুর সঙ্গে তার সম্মানজনক সহাবস্থানকে কঠিন করে তোলে। সবকিছুর মধ্যেই সংবাদমাধ্যমকে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার।

সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি গণতন্ত্র প্রসারের পরিপন্থী। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব রয়েছে যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরা।লকডাউনে যখন কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে দু'মুঠো অন্নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সাহায্যের দিকে চেয়ে থাকে তখন কোন অর্থনীতির কারণে সর্ববৃহৎ শিল্পপতিদের সম্পদের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, সেই আলোচনা সংবাদমাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের কার্যকারীতা বৃদ্ধির স্বার্থে বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার বিরুদ্ধে মিডিয়ার মুখ খোলা দরকার।একইভাবে প্রশাসনে লালফিতের ফাঁস কিংবা আর্থিক অসাধুতার প্রসঙ্গ নিয়মিত মিডিয়ায় আসা উচিত।আইন, বিচার ও প্রশাসন অর্থাৎ গণতন্ত্রের অন্য তিনটি স্তম্ভকে সঠিক পথনির্দেশ করার যে সুযোগ ও স্বাধীনতা রয়েছে সংবাদমাধ্যমকে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য সংবাদমাধ্যমের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশাও অনেক। সরকার বা শাসকদলের গুণগান করা সংবাদমাধ্যমের কাজ নয়। বরং ক্ষমতাসীনের দোষত্রুটি তুলে ধরে দেশ তথা দশের কল্যাণে তাকে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করাই সংবাদমাধ্যমের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সরকারের সাফল্যের কথা নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু তার ব্যর্থতার ওপরেই আলো ফেলতে হবে বেশি।তবেই তার সংশোধন ঘটবে।রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি পেলে তা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে।কাজেই সংবাদমাধ্যমকে সবসময় দুর্নীতিগ্রস্ত ও বাহুবলি নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভোটে জিতলেই যা খুশি তাই করার ছাড়পত্র মেলে না।বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার মতো রাজনীতির কারবারিদের দম্ভ আর ক্ষমতায় লাগাম পরানোর কাজটা মিডিয়ার।

আমাদের রাজ্য তথা রাষ্ট্রে সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ছে।এটা মানুষের বাকস্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধির একটা সুস্থ লক্ষণ।রাষ্ট্র-ক্ষমতা অনেক সময় এটা পছন্দ করে না।কিন্তু শাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যখন সেটা ঘটে তখন তা বৃহত্তর সমাজের জন্য স্বস্তিদায়ক তো বটেই।সংবাদমাধ্যমের সত্যের সন্ধান যত সফল হবে গণতন্ত্র তত বিকশিত হবে।আজ আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, সংবাদমাধ্যম নামক চতুর্থ স্তম্ভকে শক্তিহীন করে আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রকে খোঁড়া হতে দেব না।

লেখক , প্রধানশিক্ষক, কাবিলপুর হাইস্কুল

১৮ বছরেই বিশ্বজয়, বিশ্বদাবায় শাসন ভারতের

শুভ মিত্র

দেশের সব দাবাপ্রেমী অধীর আগ্রহে প্রার্থনা করছিল গুকেশ দোম্মারাজুর জয়। দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রতিদিনই লিখছিলেন দেরী হলেও গুকেশই জয়ী হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল।১৪ টি গেমের মধ্য যে ৭.৫ পয়েন্টে আগে পৌঁছতে পারবে সেই জয়ী হবে। ১৩ টি গেমের পর চিনের ডিং লিরেন ও গুকেশ একই পয়েন্টে অর্থাৎ ৬.৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল। ডিং শেষ গেম অমিমাংশিত অবস্থায় শেষ করে ম্যাচ টাই ব্রেকারে নিয়ে গিয়ে তাতে জয়ী হতে চেয়েছিল। এই ফর্মাটে ডিং বিশেষ পারদর্শী। ফলে চাপ ছিল গুকেশের ওপর।কিন্তু ৫৫তম চালে ডিং এরএকটা ভুলই গুকেশের স্বপ্ন সফল করে তুলল। তাই শেষ চাল দেওয়ার আগেই দেখা গেল গুকেশের আনন্দাশ্রু। ভারত পেয়ে গেল তার দ্বিতীয় দাবা চ্যাম্পয়ন,বিশ্বনাথন আনন্দের পর। বিশ্বের আঠারোতম

চ্যাম্পিয়ন।

প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দের ছাত্র গুকেশ তার গুরুর শহর চেন্নাই এর বাসিন্দা। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ এত কম বয়সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গুকেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গুরু বিশেষ বিশেষ সময়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন।তিনিও উচ্ছ্বসিত। চাপের মুখে শরীরীভাষা ঠিক রাখা যে তাকে মুগ্ধ করেছে তা উল্লেখ করেন তিনি।

দাবার ইতিহাসে আমেরিকার ববি ফিশারকে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড় বলে ধরা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের আনতলি কারপভ, ভিক্টর কর্নচয়, গ্যারি কাসপরভ, নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন বিভিন্নসময়ে বিশ্বশাসন করেছেন।ভারতের বিশ্বনাথন আনন্দ প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন ২০০০ সালে,তারপর ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আরো চারবার তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। বস্তুত তখন থেকেই ভারত বিশ্বের দাবা দরবারে নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

এই বছরটি বিশ্ব দাবায় ভারতের স্বর্ণযুগের শুরু বললে অত্যুক্তি হবে না। এপ্রিলে ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন করে। অলিম্পিয়াডে ভারতের পুরুষ ও মহিলারা সোনা জেতে। ১২ বছর ৭ মাসে গ্রান্ডমাস্টারের খেতাব পাওয়া প্রজ্ঞানানন্দ কিছুদিন আগেই নরওয়েতে গ্যারি কাসপরভকে হারিয়েছেন। অর্জুন এরিগেসিও বিশ্বদাবায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জার হওয়ার যোগ্যতা রাখে। মহিলা দাবা খেলোয়াড়দের মধ্যে হাম্পি কোনেরু,দিব্যা দেশমুখ,তানিয়া সচদেবেরা এগিয়ে চলেছেন। সুতরাং আগামী দিনে সোভিয়েত আধিপত্য ভেঙে ভারত যে দাবায় বিশ্বশাসন করতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

সিল্ক রুট , প্রফেসর স্মিথ ও দাবা খেলা

আশাভরী সেন

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটিতে আমাদের অর্থনীতির ইতিহাস পড়াতেন প্রফেসর স্মিথ। এক সময় চেন স্মোকার ছিলেন। আমি যখন ওনাকে ক্লাসে দেখেছি তখন ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পকেটে সব সময় থাকতো একটি পাইপ ও লাইটার। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়লে (তার জন্য ওনাকে একটু রাগিয়ে দিতে হতো), শুধু শুধু পাইপটা (তাতে তামাক নেই) পকেট থেকে বের করে মুখে কামড়ে ধরতেন। আরো উত্তেজিত হলে পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালাতেন আর নেভাতেন।ক্লাসের মধ্যেও।

কোনো টপিক জমিয়ে পড়াচ্ছেন কিনা সেটা বোঝা যেত প্রফেসর স্মিথ পকেট থেকে পাইপ বের করেছেন কিনা তা দেখে। আর যদি পকেট থেকে লাইটার বের করে ফেলতেন তার মানে সোনায় সোহাগা - এবার ভদ্রলোক যা বলবেন তা লেকচার নয় বাণী। যে টপিকে সেই বাণী, তা হুবুহু টুকে ছাপিয়ে দিলে ওই টপিকের উপর জবরদস্ত একটি পেপার লেখা হয়ে যায়।

এক বৃষ্টি ভেজা বিলেতের সকালে, প্রফেসর স্মিথ ক্লাসে বলতে শুরু করেছেন 'সিল্ক রুট' নিয়ে। এই সময় আমার ফোনে একটি টেক্সট মেসেজ আসে যা পড়ে হেসে ফেলেছিলাম। ব্যাপারটা প্রফেসরের নজর এড়ায়নি। আমাকে বললেন - 'এই যে কুইন অফ ইন্ডিয়া, সিল্ক রুট সম্পর্কে কিছু জানো ?'

প্রফেসর স্মিথকে রাগিয়ে দিতে, গম্ভীর মুখে বলেছিলাম - 'এই ক্লাসে একমাত্র আমিই বোধ হয় সিল্ক রুট নিজের চোখে দেখেছি। অতি জঘন্য আঁকা-বাঁকা একটি রাস্তা ছাড়া আর তো কিছু চোখে পড়েনি !'

প্রফেসর স্মিথ ভুরু কুঁচকে ভীষণ তাচ্ছিল্য ভরে বললেন 'জঘন্য একটি রাস্তা ! তা বটে ! ওই জঘন্য রাস্তাটা না থাকলে অর্ধেক ইউরোপ হয়তো আজও গুহায় বাস করতো ! শোনো হে, ওই রাস্তায় সিল্ক যত না পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেছে, তার চেয়ে বেশি গেছে আইডিয়া, সায়েন্স, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ফিলোসফি, আর্ট, কালচার, মিউজিক, কুইজিন। মধ্যযুগের ইউরোপ তখন নিদ্রামগ্ন। তাকে জাগিয়েছিল ওই রাস্তাটাই ! পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাস্তা ওই একটিই - দ্য সিল্ক রুট !'

সেদিন প্রফেসর স্মিথের পকেট থেকে পাইপ আর লাইটার দুটোই বেরিয়েছিল। সিল্ক রুটের উপর ৭০ মিনিটের যে লেকচারটি উনি দিয়েছিলেন তা ওই টপিকের উপর একটি অসামান্য মাস্টার ক্লাস !

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল দাবা খেলা। সেই সময় দাবাকে চতুরঙ্গ বলার কারণ খেলাটিতে হাতি, ঘোড়া, রথ ও সৈন্য;এই চারটি অংশ ছিল। ভারত থেকে খেলাটি পৌঁছে যায় পারস্যে। সে সময় পারস্যের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল বেশ জমজমাট- এবং সেটি ওই সিল্ক রুট ধরেই !

পারস্যের বণিকেরা খেলাটি দেখেন এবং বেশ পছন্দ করে ফেলেন। তাঁরা নিজ উৎসাহে খেলাটি শিখে ফেলেন। পরে পারস্যে এই খেলার কিছুটা উন্নতি হয়, 'চতুরঙ্গ' নামটা বদলে সেটিই হয়ে ওঠে 'শতরঞ্জ'। পারস্য বর্ণমালায় 'চ' এবং 'গ' না থাকায় সেটাই কালক্রমে 'শ' এবং 'জ'-তে পরিণত হয়। পারস্য থেকে শতরঞ্জ নানাভাবে ইউরোপে প্রবেশ করে। কাজেই দাবার ইউরোপ পৌঁছনোর পিছনে রয়েছে সেই সিল্ক রুট !

তবে খেলাটি ইউরোপে পৌঁছে নতুন নাম পায় 'চেস' যা পুরোনো ফরাসি ভাষা 'echec' (অর্থ চেক) থেকে উদ্ভূত। এ সময় শুধু খেলাটির নাম নয়, আরও অনেক কিছুতে পরিবর্তন আসে। ইউরোপেই দাবায় প্রথম বিশপ যুক্ত হয়। আরও পরে যোগ হয় কুইন।

গতকাল, মাত্র ১৮ বছর বয়সে (যেটি বিশ্বরেকর্ড), দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন গুকেশ। বিশ্বনাথন আনন্দের পরে আরেক

ভারতীয় দাবাড়ুর বিশ্ব জয়। জিতলেন ১৩.৫ লক্ষ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

খবরটা শুনে প্রফেসর স্মিথকে মনে পড়লো ! ভাগ্যিস সিল্ক রুটটা ভারতের মধ্যে দিয়ে গেছিলো !

fb থেকে প্রাপ্ত

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ :
শেখ হাসিনার বিবৃতিতে বলা হল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি গত ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন মহম্মদ ইউনূসের সরকার সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে দেশের 'মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র সংবেদনশীলতা নেই। তারা চান নানা রকম বয়ান উপস্থিত করে জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চিহ্ন মুছে ফেলতে।' শেখ হাসিনা বলেন যেহেতু ইউনুসের সরকার নির্বাচিত নয় তাই জনসাধারণের প্রতি ও দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি তাদের কোনও ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা নেই। ইউনুসের সরকার ক্রমাগত দেশের অভ্যন্তরের উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে তাদের প্রধান লক্ষ অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার করা এবং তাঁদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা।

শেখ হাসিনা বলেন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ ছিল শোষণ - বঞ্চনা মুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা গঠন করা। সেই কাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন শুরু করেন তখন তাঁকে সপরিবারে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভোর রাতে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা ও রেহানা, দুই বোন বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান। এর চার মাস পর ৩ নভেম্বর ঢাকা জেলে ঢুকে গ্রেপ্তার করে রাখা চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ , সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ.এফ. কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধীদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং একের পর এক হত্যা ও ক্যু। ঘাতক ও তাদের দোসররা ইতিহাসের এইসব জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করার জন্য জারি করে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'। অর্থাৎ হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র ছিলনা। ছিল একচেটিয়া সামরিক শাসন। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফেরেন। তীব্র গণ আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শেখ হাসিনা সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর সময়ের পরিস্থিতির তুলনা করে বলেছেন , ক্ষুব্ধ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করে গত ১৫ বছরে ধরে তার সরকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে।কৃষি , শিল্প , তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্যসহ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছিল।... 'আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে বিশ্বের দরবারে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করা'। হাসিনা প্রশ্ন করেন 'কিন্তু সেই সোনার বাংলা আজ কোথায়? দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির তীব্রতায় দেশের মানুষ জর্জরিত।'

এই বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেছেন 'দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশবিরোধী গোষ্ঠী অবৈধ ও অসাংবিধানিক পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অগণতান্ত্রিক শক্তির দেশের জনগণের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তারা ক্ষমতা দখল করে সকল জনকল্যাণমুখী কাজে বাধা দিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই। যা কিছু আচার তারা দায়সারা ভাবে পালন করছে , সেটা মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য।'

শেখ হাসিনা তাঁর এই বিবৃতির শেষে বলেন 'স্বাধীনতা বিরোধীদের বারে বারে পরাস্ত করেছে বাঙালিরা। এ বারেও ভয়ঙ্করপ্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিখা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত হয়ে জয়ী করবে বাঙালিকে।'

মহম্মদ ইউনুসের সরকার ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সার্কুলার দেয়। কিন্তু পরে আর একটি সার্কুলার দিয়ে বলে বিজয় দিবস পালন করা যাবে কিন্তু এই উপলক্ষ্যে কোনও আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠান করা যাবেনা। চমৎকার সিদ্ধান্ত ! আলোচনা হলে প্রকৃত সত্য অনেকেই তুলে ধরবেন। বলবেন।

বাংলাদেশে এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে পাক সেনা ও রাজাকারদের হাতে নিহত কোনও মুক্তিযোদ্ধার সমাধি নেই।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বক্তব্য

এদিকে গত ১৪ ডিসেম্বর 'বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে' রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে সকালে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস শহীদ বেদীতে মালা দেবার পর সেখানে মানুষের ঢল নামে। এক ফাঁকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও সেখানে মালা দেওয়া হয়। এই দিন পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অবরোধ করে রেখেছিল, যাতে সেখানে কেউ ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে না পারে। মনে রাখা দরকার

১৯৭১সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক অধ্যাপককে রাজাকাররা পাক সেনাদের সাহায্যে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। জামাত এ ইসলামী নিয়ন্ত্রিত ইউনূস সরকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি কি মনোভাব তা এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। এখন 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া কার্যত নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের পতাকা বহন করলেও খোঁজ নেওয়া হয় এরা কারা। বাংলাদেশের পতাকা মাথায় ফেটটি করে বাঁধা যায় ওটা মেধাবী তথাকথিত ছাত্রদের স্টাইল।

জামাত আয়োজিত এক আলোচনা সভায় গত ১৫ ডিসেম্বর ওই দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির হেলাল উদ্দিন সাহেব বলেছেন ১৯৭১ নয় ১৯৬৫ সালের চেতনায় বাংলাদেশীদের আলোকিত হতে হবে। হেলাল সাহেব বলেন ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারত পাকিস্তানের কাছে পরাস্ত হয়। তার প্রতিশোধ নিতেই ভারত ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে দুই টুকরো করে। হেলাল সাহেব বলেন '১৯৬৫ সালের ইমান এখনও তাদের হৃদয়ে জাগ্রত আছে। অতএব হুমকি দিয়ে লাভ নেই।' তিনি বলেন '১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী।' ওই সভায় বিএনপি'র এক নেতা আবু নাসের মহম্মদ রহমতুল্লা বলেন তার মতে 'ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোনও সহযোগিতা করে নাই। ভারত তার স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতার ভান করেছিল। ভারতের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে একটা পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে এই দেশকে শোষণ করা।'

একজন বিএনপি নেতার বক্তব্য

(বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুর রহমান, বিএনপি নেতা)

আওয়ামিলীগ না হয়েও যে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু কে ধারণ করা যায়, তার প্রকৃত উদাহরণ এই লেখাটি।

এই দেশের সবচেয়ে খারাপ মানুষের নাম হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান! ইউনুস সাহেব তো, ১০ জন প্রধানমন্ত্রী লম্বা করলে যত লম্বা হবে তার চেয়েও অনেক লম্বা মানুষ! তাহলে তিনি ইলেকশন দিতে চায় না কেন ?

আমি যে কথা বলছিলাম, এদেশের সবচেয়ে খারাপ মানুষের নাম শেখ মুজিবুর রহমান! আমি বঙ্গবন্ধু নাই বা বললাম। কারণ বঙ্গবন্ধু বললে আমার দলে আমার নাম্বার কাটা যাবে। আমি বিএনপি করি, আমার দলে আমার নাম্বার কাটা যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান খুব খারাপ লোক ছিল। এই দেশে ইস্পাহানি, আদমজী, দাউদ,বাওয়ানী সাইমলদের নাতিরা এসে গাড়ি চালাতো রোলস রয়েজ, মার্সিটিজ। আমরা রাস্তায় দাড়াইয়া দেখতাম। আমরা তাদের আদমজী নগরের কর্মচারী হইতাম। খুব হইলে আমরা বাওয়ানী জুট মিলের ম্যানেজার হইতাম। শেখ মুজিবুর রহমান জেল খেটে, জুলুম সহ্য করে এটা থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন।

আর ওই যে পাকিস্তানি সুন্দর সুন্দর ছেলেরা এসে আমাদের সুন্দরী বিয়ে করে করাচি পিন্ডিতে নিয়ে যেতো, আর আমরা মনে করতাম আমাদের ভাগনে ভাগনি খুব সুন্দর হইছে। এইটা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের বঞ্চিত করেছে। খুব খারাপ মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান। ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও বাঙ্গালীর কথা বলেছে! কেউ জানেন কি না আমি জানি না, ১৯৬৯ সনের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙ্গালীর হয়েই লড়ছে। ১৯৬৭ সনের নভেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান কে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ক্যান্টমেন্ট নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পুলিশ কে বলেছিলেন 'ভাই তোমরা দাড়াও', তিনি মাটিতে কপাল ছুঁয়ে বললেন 'আমি এই বাংলার মাটিতে জন্মেছি, এই মাটিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়'।

সেই শেখ মুজিবুর রহমান খুব খারাপ মানুষ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পড়েও আয়ুব খানদের সঙ্গে আপোষ করেন নাই। খুব খারাপ মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী ১১ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে জেল থেকে বেরিয়ে এসে রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারী মিটিং করেন এবং ওখানে বঙ্গবন্ধু উপাধি পান। বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার পরে একদিনের জন্যও আপোষ করেন নাই।

৭০ এর নির্বাচনে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পাকিস্তানে মেজরিটি হলো। আমার নেতা মন্টু ভাই স্বাক্ষী, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সনে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে মিটিং করে বললো ছয় দফা দাবির দাড়ি, কমা, সেমিক্লোন বাদ দিয়েও যদি আপোষ করি আপনারা আমাদের জ্যান্ত কবর দিবেন।

সে আপোষ না করে শেখ মুজিবুর রহমান খুব খারাপ কাজ করেছিলেন। এই খারাপ কাজের জন্য ই দেশটা মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পৌছায়।

আজকে ৭ ই মার্চের সেই ভাষন 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা সব বন্ধ করে দেবা'। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। মুক্তি যুদ্ধের কথা, গেরিলা যুদ্ধের কথা, এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, তখন রক্ত আরো দিবো। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ ই মার্চ এখন আপনাদের কাছে কিছুই না। এখন বলেন এটা কোন কথাই না। উনি তো ১৪ ই মার্চ ইয়াহিয়া খান আসছিলো, আপোষ আলোচনা করেছে। আরে আলোচনা তো ইরান, ভিয়েতনাম সহ কত দেশেই হয়েছে। তাই বলে কি বলা যাবে স্বাধীনতা চায় নি ? মুক্তি চায় নি ?

আলাপ তো হবেই। এখন যে ইসরায়েল বনাম গাজা এবং লেবানন যুদ্ধ হচ্ছে এখানে আলোচনার জন্য সারা বিশ্ব চেষ্টা করছে না? এখানে এটা বলা যাবে যে গাজা উপত্যকা আপোষ করতে চায়? নো, এটা বলা যাবে না। এসব বলে শেখ মুজিবুর রহমান এর মতো খারাপ লোককে আরো খারাপ করতে চায়।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের প্রতিটি যুদ্ধের ক্যাপ্টেন

এর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে জিয়াউর রহমান একটা সেঞ্চুরি মারছে। নতুন কেয়ার ওয়ে তে। ২৬ শে মার্চ নয়, ২৭ শে মার্চ একটা সেঞ্চুরি মারছে। আমি তাকেও ছোট করতে চাই না। উসমানী কেও না। তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী আমি কাউকেই ছোট করতে চাই না।

বাঙ্গালী জাতি ইতিহাসের সবকিছু ভূলে বসে আছেন। কেন? বাঙালী আমরা কিছু ই করতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুক ফুলাইয়া বলি আমরা বাঙ্গালী। আমরা একটা স্বাধীন জাতি। হতে পারে আমাদের অনেক ভূল ত্রুটি আছে, এখন ঠিক কইরা নেন।

ইউনুস সাহেব তো লম্বা মানুষ, তো উনি ইলেকশন দিতে চায় না কেন ? ইলেকশনের বিষয় উনার মুখ ছোট হয়ে যায় কেন ? উনার গলায় যেন কাঁটা আটকে পড়ে। জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুক। আর যদি উনি মনে করে এই যে, পোলানগো নিয়ে উনি মন্ত্রীসভা গঠন করেছে, এরা খুব জনপ্রিয়। তাহলে ইলেকশন দিয়ে দেখুক মেম্বারের ভোট পায় নাকি ?

আমি তাই আজকে আপনাদের কে বলি আজকে তারেক রহমান বিদেশ কেন ? আসছেনা কেন ? এর পিছনে রহস্য কি? ইউনুস সাহেব যদি নিজের মামলা প্রত্যাহার করে নিতে পারে, তাহলে তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহার করে দেশে আনুক। দেখুক তারেক জনপ্রিয়তা টা কি ?

এদিকে সংস্কারক ডঃ আলী মিয়া, তিনি নাকি সংস্কার করবে? ৪০ বছর যিনি দেশে নাই, তিনি নাকি করবে সংস্কার? আমার মানতে হবে। মানি না আপনাদের সংস্কার। সংস্কার করবে এদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা। আমি চাই এটা। ইলেকশন দিন। কয় বছর নিবেন? এক বছর? দেড় বছর? নেন দেড় বছর। আর কি চান? বটগাছ থেকে কি কলা গাছ বড় হয়? বটগাছ অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারের আয়ু যদি হয় ৫ বছর। কলাগাছ অর্থাৎ অনির্বাচিত সরকারের তো দুই বছর হওয়ার কথা। এটা মানেন না কেন ?

ইদানীং ইউনুস সাপের সচিব না কি খুব বড় বড় কথা বলে। আরে চাকরের আবার কথা কী ? চাকর চুপচাপ থাকো। যদি রাজনীতি করতে চান তাহলে চাকরি বাদ দিয়ে এসে পলিটিক্স করেন। জমি টা কি আপনার? আপনার সি এস ও আর এস আছে নাকি ? নো, সি এস ও আর এস এর মালিক এদেশের জনগণ।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার স্পিচ রাইটার কে?

তসলিমা নাসরিন

পোড়া বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার উপদেষ্টা কে? কে তাঁর স্পিচ রাইটার? একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের কোলের ওপর বসে থেকে তিনি বলছেন একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি, মনে হচ্ছে, তাঁর বান্ধবী হাসিনার কোনও স্পিচ পুরোটাই নিজের বলে মনে করেছেন। তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির যেকোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়েছেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবীসহ মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে মুহম্মদ ইউনুস বলেছেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।'

ও মাই গড। তুই তো ব্যাটা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসরদের সবচেয়ে বড় দোসর এখন। তুই তো তাদের স্বার্থ কায়েম করছিস গদিতে বসে। রিসেট বাটন টিপে মুক্তিযুদ্ধকে এবং একাত্তরের ইতিহাসকে উধাও করে দিয়েছিস। তুই ২৪য়ের জিহাদি আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলছিস। তোর দোসরদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত ভাস্কর্য ভেঙ্গে গুঁড়ো করে, মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত ইতিহাস পুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জাদুঘর ধ্বংস করে দিয়েছিস। কোন মুখে তুই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাস? দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে তো ভাল পারিস, কিন্তু দর্শকদের এত বোকা ভাবলে চলবে? কথা আছে না, আমাকে তুমি কিছুদিন বোকা বানাতে পারো, কিন্তু প্রতিদিন পারো না?

ভাবা যায় মুহম্মদ ইউনুস বলেছেন, 'বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দিন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড.জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা সহ আরও অনেকে। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য , স্বাধীনতাবিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়।"

ও মাই গুডবাম্পস। তোর মতো স্বাধীনতাবিরোধী আছে কজন দেশে! স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক দালালের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নেতা শাহরিয়ার কবীরকে জেলে ভরে রেখেছিস, শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের কন্যা শমী কায়সারকে জেলে ভরে রেখেছিস। স্বাধীনতাবিরোধীদের উপদেষ্টা বানিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানকে বন্ধু বানিয়ে, তারা যাদের হত্যা করেছে, কোন মুখে সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিস?

তোর স্পিচটা কে লিখে দিয়েছে রে? হাসিনা?